আবহাওয়ার পূর্বাভাস

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

অরূপরতন ভট্টাচার্য

বেস্টবুক্স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

আবহাওয়া এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে সাধারণ মানুষ সকলেরই অল্প-বিস্তর যোগাযোগ আছে। এই যোগাযোগ মূলত আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে অবলম্বন করে। অথচ বিষয়টি আজও হাওয়া-আফিসের বিজ্ঞানীদের বিষয়। তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই চলে।

আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃত্রিম উপগ্রহের যুগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমাদের কাছে অনেক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। এক সময়ে যা ছিল অজ্ঞেয় এবং অনিশ্চিত ও অনির্ভর, এখন তা অনেক আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয়সম্পন্ন। কিন্তু পূর্বাভাস-কেন্দ্রিক আবহ-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের কতটুকুই বা পরিচয় ঘটেছে?

এই বইয়ের ভেতরে সেই পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করেছি ছোট বড় সকল কৌতূহলী পাঠকের সঙ্গে।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আনন্দ মোহন কলেজ
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পুস্তক মেলা
২৯. ১. ৯২

সূচীপত্র

মেঘ

আজ কি বৃষ্টি হবে ?

ছাতা কি সঙ্গে নিয়ে বেরোব ?

যদি বৃষ্টি হয় তো বলার কিছু নেই। ছাতা তখন বন্ধুর মত, অসময়ের সঙ্গী। কিন্তু বৃষ্টি না হলে ছাতা এক বাড়তি বোঝা। আজকাল ভিড় ট্রাম বাসে এমনিতেই পথ চলা দায়। সেখানে বিসদৃশ এক ছাতা বয়ে নিয়ে বেড়ানো সত্যিই অস্বস্তিকর। তবু ছাতা গুটিয়ে ভাঁজ করা গেলে কিছুটা সুবিধে কিন্তু দাদুর ছাতার মত বাঁটওয়ালা ছাতা, কখনো একে খোঁচা দিচ্ছে, কখনো ওকে। লোকে বিরক্ত হয়। তবু বৃষ্টি হলে ছাতা তো নিতেই হবে সঙ্গে।

কিন্তু ঘাড়ে ছাতা নিয়ে বেরোলাম বৃষ্টি হবে ভেবে—সারাদিন ছাতা বয়ে বেড়াতে হল—অথচ এক ফোঁটা বৃষ্টি হল না। তাহলে কেমন বিচ্ছিরি লাগে! কাগজে আবহাওয়ার খবর রোজ ছাপা হয়, টি ভি থেকেও সে খবর জানা যায়, রেডিওতেও রোজ বলে, বৃষ্টি হবে কি হবে না।

আবহাওয়ার ঝড় জলের খবর যদি রোজ মিলে যায়, তাহলে ছাতা সঙ্গে বওয়াটা কাজে লাগে। বৃষ্টিতে গাছের তলায় দাঁড়াতে হয় না, গাড়ি বারান্দায় যখন অনেকে বৃষ্টি কখন ধরবে ভেবে ঠায় অপেক্ষায়, তখন পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাওয়া যায় স্বচ্ছন্দে, গা-মাথা ভেজার আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু আবহাওয়া আফিস থেকে পাঠানো পূর্বাভাসের কথা শুনলে অনেকেই মুখ বাঁকায়। পূর্বাভাসে দিনে বৃষ্টি-বাদলের সম্ভাবনার যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, সেই হিসেব ধরে চলতে গিয়ে ভুল হয়েছে, এমন অভিজ্ঞতা ভুরি ভুরি।

কাগজে আছে, আজ বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত মনে খালি হাতে বেরোলাম ছাতা ছাড়াই। এদিকে পথে নেমে গেল

বৃষ্টি। তাহলেই মুশকিল। কতক্ষণ বৃষ্টিতে আর অপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু উপায়ই বা কি ?

কিম্বা কাগজে বেরোল, আজ ঝড়-ঝঞ্ঝা সমেত কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বিচক্ষণ ব্যক্তির মত ভেবে-চিন্তে ছাতা নিয়ে বেরোলাম বা রেন কোট সঙ্গে নিলাম। কিন্তু সারাদিন ছাতা এক বোঝা হয়ে রইল। বৃষ্টির সাড়া-শব্দ নেই। কার তা আর ভাল লাগার কথা !

আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে সকালবেলায় চায়ের টেবিলে দৈনিক কাগজ হাতে আবহাওয়া আফিসের পূর্বাভাসকে ঘিরে জোর রসিকতা চলতো। যে হিসেব কচিৎ-কদাচিৎ মেলে রসিকতা তাকে নিয়েই জমে ভাল। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ছিল রসিকতার একটা আদর্শ বিষয়।

কিন্তু আজ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা অনেকটা বদলে যাচ্ছে। শুধু আবহাওয়ার পূর্বাভাসের বেলায় কেন, বিজ্ঞান আজ মানুষের জীবনযাত্রায় হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রে অনেক সূক্ষ্মতা নিয়ে এসেছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুধু বৃষ্টিপাত হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলে না, তার জগৎ অনেক বড়। সারা বছর, প্রতিটা মুহূর্তই আমরা বিশ্ববাসীরা আছি আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে। সেখানে উত্তাপ-শৈত্য আছে—কতটা ঠাণ্ডা পড়তে পারে আজ, গরমই বা কেমন থাকবে ; বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণটাও ধরতে হয়—শুকনো হাওয়ায় শরীর কি রকম বিদ্ধ হবে বা ঘামে কতখানি অস্থির হয়ে উঠবো।

কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের কথাটাই আগে আমাদের মনে পড়ে। এই বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মেঘের সম্পর্ক। আকাশে মেঘ দেখা দিলে তবেই আমরা বৃষ্টিপাতের কথা ভাবি, না হলে নয়। একথা ঠিক যে, মেঘ থেকেই বৃষ্টি আসে, কিন্তু সব মেঘই তো আর বৃষ্টি দেয় না।

আকাশে যত রকমের মেঘ দেখি, মনে হয় তার যেন শেষ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মেঘকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

একই বাড়ির পাঁচটা ছেলে যেমন তাদের চেহারা অনুযায়ী পাঁচ ধরনের হয়, তেমনি মেঘও তার আকার-আকৃতি অনুযায়ী এক এক রকমের। সেইজন্যে কোনো মেঘের নাম স্তর-মেঘ, কোনো মেঘ পুঞ্জ-মেঘ, কোনো মেঘ আবার উর্ণা-মেঘ।

তা ছাড়া মেঘের শ্রেণীর ক্ষেত্রে আরও মাপকাঠি আছে। কেউ আমার প্রতিবেশী—এক পাড়ার লোক, কেউ থাকে পাড়া ছাড়িয়ে —কিন্তু বেশি দূরে নয়, আর কেউ হতে পারে আছে অন্য আর এক অঞ্চলে—নাগালের রীতিমতো বাইরে। মেঘেরাও সে রকম, ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে উচ্চতা অনুযায়ীও মেঘকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে— নিম্ন-মেঘ, মধ্য-মেঘ ও উচ্চ-মেঘ। নাম থেকেই কোন মেঘের উচ্চতা কি রকম, সহজে বোঝা যায়। নিম্ন-মেঘ আমাদের সবচেয়ে কাছের মেঘ, আছে ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে ৩০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত। মধ্য-মেঘ নিম্ন-মেঘের ঠিক উপরে, ঊর্ধ্বাকাশে আরও ৩০০০ মিটার পর্যন্ত তার সীমানা, অর্থাৎ ৩০০০ মিটার থেকে ৬০০০ মিটারে তার অবস্থান। আর নিম্ন-মেঘ, মধ্য-মেঘকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরে আছে উচ্চ-মেঘ। এর সঙ্গে আর এক ধরনের মেঘের কথা বলা যায়। এর নাম স্তম্ভমুখী বা স্তম্ভাকার মেঘ (Towering cloud)। এর তলভাগের উচ্চতা খাঁটি নিম্ন-মেঘের তলভাগের মত হতে পারে কিন্তু এক পায়ে খাড়া তালগাছ যেমন সব গাছকে ছাড়িয়ে যায়, তেমনি এর মাথা সব ধরনের মেঘ পার হয়ে ১৫০০০ মিটারের চেয়েও বেশি হওয়া সম্ভব।

শুধু মাটি ছাড়িয়ে উপরে নয়, মেঘ দেখা যায় ভূ-পৃষ্ঠেও। ভূ-পৃষ্ঠে যে মেঘের সৃষ্টি, তার নাম কুয়াশা।

১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লিউক হাওয়ার্ড (Luke Howard) মেঘের চেহারা অনুযায়ী তাকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এর একটা ভাগের নাম পুঞ্জ-মেঘ। ইংরেজিতে বলা হয় Cumulus।

আর একটা ভাগ স্তর-মেঘ (Stratus), তা ছাড়া আছে উর্ণা-মেঘ (Cirrus)। পুঞ্জ-মেঘ, স্তর-মেঘ আর উর্ণা-মেঘের সমষ্টিকে নিয়ে আর একটি ভাগ সৃষ্টি। সেটির নাম নিম্বাস (Nimbus)।
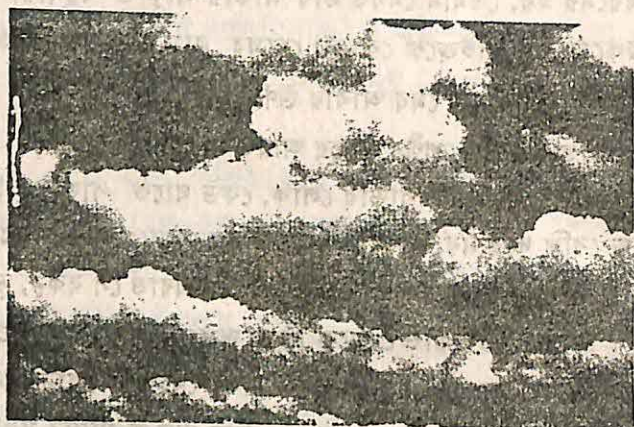
পুঞ্জ-মেঘ

পুঞ্জ-মেঘ ঘন মেঘ—নামের মধ্যেই এর চেহারার একটা আভাস পাওয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ যেমন দেখা যায়, একের পর এক এগিয়ে আসছে, আছড়ে পড়ছে তটদেশে, আকাশে পুঞ্জ-মেঘ নজরে আসে অনেকটা সেইভাবে। এ এক একটা ঢেউ যেন, আছে একটার উপরে আর একটা। এ মেঘে এমনিতে বৃষ্টি হওয়ার কথা

স্তর-মেঘ

নয়। আকাশে এই মেঘ দেখা যায় ৫০০ মিটার থেকে ৩০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত। পুঞ্জ-মেঘ যখন ছোট ছোট হংস বলাকার

মত ভেসে বেড়ায়, তখন তাকে বলা হয় উত্তম আবহাওয়ার পুঞ্জ-মেঘ (Fair weather cumulus)।

কিন্তু এই মেঘ কখনো কখনো ফুলকপির মত মাথা চাড়া দিয়ে মধ্যস্তরে পৌঁছোয়। পুঞ্জ-মেঘ সে সময়ে আর শুধু পুঞ্জ-মেঘ নয়,
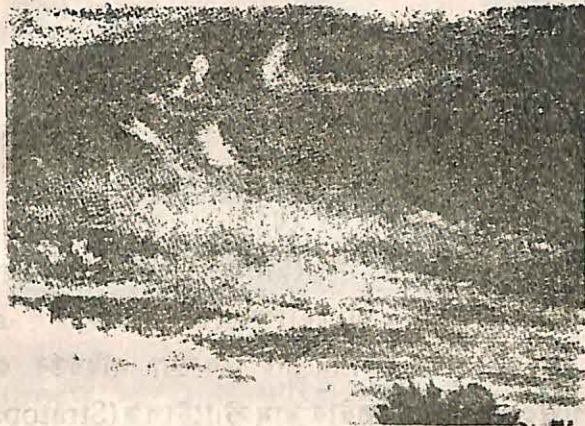
উর্ণা-মেঘ

তখন তার নাম বিশাল পুঞ্জ-মেঘ (Large cumulus)। এই বিশাল পুঞ্জ-মেঘ যদি আরও বাড়তে থাকে, তাহলে কি হবে? মেঘের মাথা তখন মধ্যস্তর ছাড়িয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে। মধ্যস্তর ৩০০০ থেকে ৬০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত, উচ্চস্তর তার উপরে। উচ্চস্তরে পুঞ্জ-মেঘ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছোবার উপক্রম করে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে আবহমণ্ডলকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। একটা টেবিলের উপরে দেওয়াল ঘেঁসে অঙ্কের বই রাখলাম। তার উপরে ইতিহাসের মোটা বই, তারপর টেস্ট পেপার, ভূগোল। এইভাবে থাকে থাকে বই সাজানোর মত পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে শুরু করে উপর দিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা চলে। টেবিলটা যেন ভূ-পৃষ্ঠ। এই ভাগের বেলায় প্রথম ভাগটার নাম ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), তারপর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার

(Stratosphere), মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere) এবং থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere)।

ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে ক্রমাগত উপর দিকে উঠতে শুরু করলে তাপমাত্রা ক্রমশ কমে আসে। এই অঞ্চলটাই ট্রোপোস্ফিয়ার। প্রায় ১৫—১৬ কিলোমিটার উচ্চতায় এই তাপমাত্রা কমে প্রায় —৫৫ ডিগরি সেলসিয়াসের কাছাকাছি দাঁড়ায়। এরপর প্রায় ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ প্রায় ২১—২২ কিলোমিটার পর্যন্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে। একে বলা হয় ট্রোপোপজ (Tropopause)। তারপর আবার তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। যে উচ্চতা থেকে তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে সেখানে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের শুরু। প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সমাপ্তি। এরপরেও আবার কিছুদূর পর্যন্ত তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। ট্রোপোপজের মত এই অঞ্চলটার নাম স্ট্র্যাটোপজ (Stratopause)। স্ট্র্যাটোপজের বিস্তৃতি ৫০ থেকে ৫৫ কিলোমিটার। এখানকার তাপমাত্রা -৫ ডিগরি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এর উপরে তাপমাত্রা আবার কমতে থাকে এবং ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত কমেই চলে। এই স্তরের নাম মেসোস্ফিয়ার। এর উপরে তাপমাত্রা স্থির থাকার অঞ্চল মেসোপজ (Mesopause)। এর বিস্তৃতি ১০ কিলো-মিটারের মতন। এখানকার তাপমাত্রা -৯৫ ডিগরি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। থার্মোস্ফিয়ার শুরু হচ্ছে ৯০ কিলোমিটার উচ্চতায়। এখানে তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলে।

আবহমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বলতে গেলে সমস্ত মেঘের খেলা চলে ট্রোপোস্ফিয়ারে। আসলে ভূ-পৃষ্ঠের নিচের তলা অর্থাৎ ট্রোপোস্ফিয়ার আর তার উপরের তলা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য পাঁচিল আছে। ফলে এদিককার হাওয়া ওদিকে যেতে পারে না। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বায়ুস্তরের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত শীতল। সেইজন্যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কোনো উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহ

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ঢুকে পড়লেও আর উঠতে পারে না। ওই বায়ু-প্রবাহ তখন আশেপাশের বাতাসের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। আর
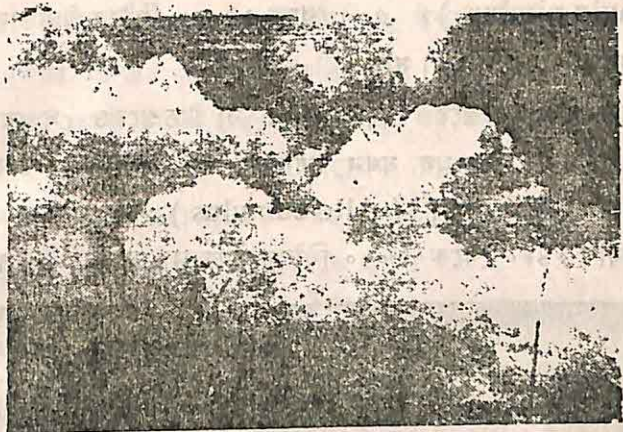
৮
বজ্র-মেঘ

ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারিও বটে। ফলে সেই বায়ুপ্রবাহ 'পুনর্মূষিক ভব' হয়ে ফিরে আসে আবার ট্রোপোস্ফিয়ারে।
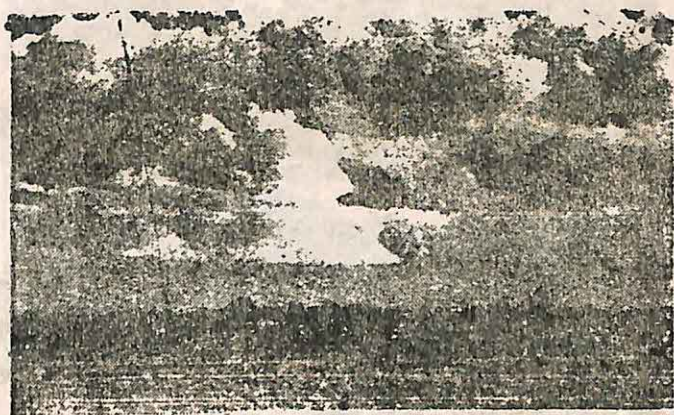
কোদালে কুড়ুলে মেঘ

অদৃশ্য পাঁচিল বাধা দেওয়ার জন্যে হাওয়া উপর দিকে যেতে না পারলে স্বভাবতই তা ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে। মেঘের আকৃতি তখন অনেকটা ব্যাঙের ছাতা বা কামারের নেহাইয়ের মত। এই

মেঘ থেকে খুব বৃষ্টিপাত হয়, মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি নামে, বজ্রপাতও হয়ে থাকে। একে বলা হয় বজ্র-মেঘ (Thunder cloud বা Cumulo-nimbus)। ৫০০ থেকে ১৫০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে সাধারণত এদের পাওয়া যায়।

পুঞ্জ-মেঘ মধ্যস্তরেও হতে পারে বা উচ্চস্তরেও সে মেঘ জন্ম নিতে পারে। পুঞ্জ-মেঘ যখন মধ্যস্তরে জন্ম নেয়, তখন তার নাম 'কোদালে কুড়ুলে মেঘ' (Alto-cumulus)। সচরাচর এ মেঘ দেখা যায় ২৪০০ থেকে ৬০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে। জলকণায়

ঊর্ণা-পুঞ্জ মেঘ

তৈরি এ মেঘ, কখনো কখনো এ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। যখন এ মেঘের একটা অংশ আর একটা অংশের চেয়ে উপরে উঠে যায়, তখন বোঝা যায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আর পুঞ্জ-মেঘ যখন উচ্চস্তরে তৈরি হয়, তখন তার নাম ঊর্ণা-পুঞ্জ-মেঘ (Cirro-cumulus)। এই মেঘের অবস্থিতি ৬০০০ থেকে ১২০০০ মিটারের মধ্যে। এ ধরনের মেঘ থেকে একটা উষ্ণ প্রবাহের আভাস পাওয়া যায়।

পুঞ্জ-মেঘ যেমন বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে থাকে, তেমনি স্তর-মেঘও।

ভূ-পৃষ্ঠেও যেমন তাকে দেখা যায়, তেমনি সে নিম্ন-স্তরে, মধ্য-স্তরে এবং উচ্চ-স্তরেও গঠিত হয়। স্তর-মেঘ যখন ভূ-পৃষ্ঠে থাকে, তখন তা কুয়াশা। যখন কুয়াশা মাটি ছাড়িয়ে উপরে উঠে অবয়বহীন মেঘের একটা আস্তরণের মত তৈরি করে, তখন তাকে স্তর-মেঘ বলে। স্তর-মেঘের বৈশিষ্ট্যের আভাস তার নামের মধ্যেই পাওয়া যায়। স্তর-মেঘ অত্যন্ত সুষম ধরনের মেঘ। এই মেঘকে ইংরেজিতে বলা হয় Stratus। এই ধরনের মেঘ থেকে কেবল ঝিরঝিরে বৃষ্টি হতে পারে। ভূমি থেকে এর উচ্চতা ২০০০ মিটারের মত।

শীতের ভোরে আবার অনেক সময়ে নজরে আসে, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। দিনের আলোয় পৃথিবী উজ্জ্বল ও

নিম্নস্তর-মেঘ

আলোকময় হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু সে রকমভাবে দিনের আলো ফুটে উঠছে না। বাতাসে একটা ভিজে ভিজে ভাব। এরই মধ্যে কখনো বাতাসের সামিয়ানা ফুটো করে দিনের আলো চলে আসে পৃথিবীতে। জমাট মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়। অনেক

নিচের মেঘ এ—হাওয়ার সঙ্গে শাঁ শাঁ করে ছুটে চলে—বিশেষ কোনো আকার নেই। এর নাম নিম্নস্তর-মেঘ। ইংরেজিতে বলে Nimbo-stratus। নিম্নস্তর-মেঘের ভূমির উপরে উচ্চতা ১৫০০ মিটার থেকে ৩-৪ হাজার মিটার মত। এই মেঘ থেকে একটানা বৃষ্টি হয়। কোনো আবহাওয়া প্রণালীর সঙ্গেই এমন মেঘ দেখা যায়।

আকাশে মেঘেরা যে একে আর একটার সঙ্গে আড়াআড়ি করে থাকে, তা নয়। কখনো কখনো নজরে আসে পুঞ্জ-মেঘ এসে মিশেছে নিম্নস্তর-মেঘের সঙ্গে। এই মেঘের নাম পুঞ্জস্তর-মেঘ (strato-cumulus)। পুঞ্জস্তর-মেঘ নিম্নস্তর-মেঘের সঙ্গে মিশে তৈরি বলে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, তা নিম্ন-স্তরের মেঘ। ১৫০০ মিটার থেকে ২৫০০ - ৩০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে এই মেঘ দেখা যেতে পারে।

স্তর-মেঘ যেমন নিম্ন-মেঘের বেলায় নিম্নস্তর-মেঘ, তেমনি যখন সে মধ্য-স্তরে দেখা যায়, তখন তার নাম মধ্যস্তর-মেঘ, আর উচ্চ-

মধ্যস্তর মেঘ
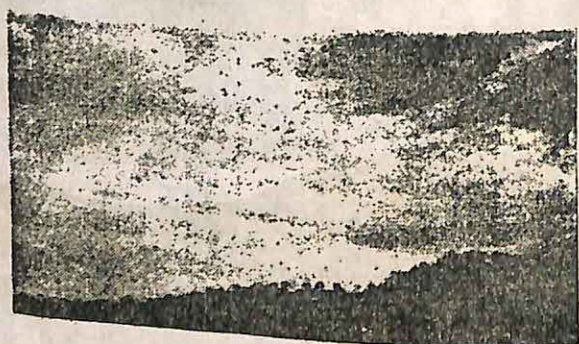
স্তরের বেলায় সে উচ্চস্তর-মেঘ। মধ্যস্তর-মেঘ থাকে ২৪০০ থেকে ৬০০০ মিটার উচ্চতার ভিতরে। এই মেঘের বিদেশী নাম Alto-stratus। সূর্য বা চন্দ্রকে এই মেঘের ভিতর দিয়ে দেখবার সময়ে কেমন লাগবে? সূর্য বা চাঁদ আকাশের যেখানে আছে, মেঘের

আড়ালে সেখানে তাদের তুলনায় বেশি আলোকোজ্জ্বল মনে হবে। তা থেকেই আকাশের কোন অঞ্চলে কে আছে বোঝা সম্ভব। কিন্তু এই মেঘের ভিতর দিয়ে এদের গোল পরিধিটা ফুটে ওঠে না। মধ্য স্তর-মেঘ সাধারণভাবে ১ কিলোমিটার থেকে ২ কিলোমিটারের মত পুরু। তবে বিস্তৃতি আরও একটু বেশি পুরু হলে, এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ মেঘে যে বৃষ্টি নামে তা ঝমঝমে বৃষ্টি নয়, সে বৃষ্টি একটানা হালকা বা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর স্তর-মেঘ যখন উচ্চস্তর-মেঘ (Cirro-stratus), তখনও মধ্যস্তর-মেঘের মত তাকেও দেখা যায়, সমস্ত আকাশে সে ছড়িয়ে আছে।
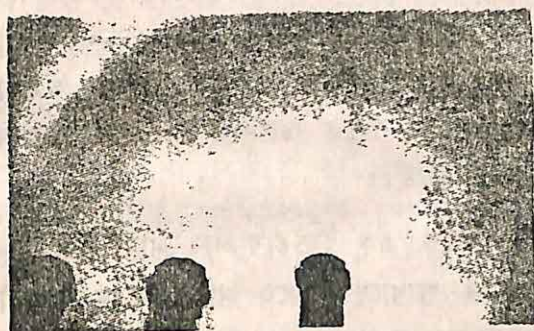
উচ্চস্তর মেঘ

সূর্য, চন্দ্রকে ঘিরে এই মেঘ একটা জ্যোতির্মণ্ডল তৈরি করে। এই মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য-চন্দ্রের কিনারা বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। এই মেঘ দেখা যায় ৬০০০—১২০০০ মিটার উচ্চতায়।

পুঞ্জ-মেঘ এবং স্তর-মেঘের সঙ্গে আর যে মেঘটির কথা বলতে হয়, তার নাম ঊর্ণা-মেঘ। এই মেঘ ঘোড়ার লেজ বা মাকড়সার পাতলা জালের মত। প্রায় ৭৫০০ মিটার উচ্চতায় বা তার চেয়েও বেশি উঁচুতে এই মেঘ তৈরি হয়। এই উচ্চতায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের চেয়ে অনেক কম। সেইজন্যে এখানকার মেঘ পুরোটাই হিমকণার সমষ্টি। এই মেঘে কোনো বৃষ্টি হয় না।

নিম্বাস মেঘ কাকে বলে ?

নিম্বাস মেঘ পুঞ্জ, স্তর আর উর্ণা—এই তিন ধরনের মেঘেরই সমষ্টি। নিম্বাস মেঘ হল বৃষ্টির মেঘ। এই মেঘেই বৃষ্টি নামে বা তুষারপাত হয়। এক বিশেষ ধরনের মেঘ আছে, নাম নিম্বোস্ট্র্যাটাস (Nimbo-stratus)। সাধারণ স্তর-মেঘ যখন প্রচুর জলে ভরে যায়, তখন তা অনেক ঘন হয়ে ওঠে। আর ঘন হলে তা ভারি হয় ও নেমে আসে। সাধারণভাবে মধ্য-মেঘের অবস্থান ৩০০০ থেকে ৬০০০ মিটারের মধ্যে। কিন্তু মধ্যস্তর-মেঘ অনেক জলসঞ্চয় করলে তা অনেক সময়ে ২০০০ মিটার উচ্চতায় নেমে আসে। ২০০০ মিটারে মেঘের নিচের দিকটার অবস্থান কিন্তু মাথাটা থাকে ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার অর্থাৎ ৪০০০ থেকে ৫০০০ মিটার উচ্চতায়। নিম্বোস্ট্র্যাটাস মেঘেই দিনের বেলায় রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কে বলতে পারবে, কটা বাজলো তখন ঘড়িতে।

আকাশের এক এক উচ্চতায় আর নানা ধরনের মেঘ নিয়ে যত রকমের মেঘ আমাদের নজরে আসে, আবহ-বিজ্ঞানীরা তাদের মোট ১০ ভাগে ভাগ করেছেন।

এর মধ্যে উচ্চ-মেঘ তিন ধরনের

১. উর্ণা মেঘ (Cirrus)
২. উর্ণা-পুঞ্জ মেঘ (Cirro-cumulus)
৩. উর্ণা-স্তর মেঘ (Cirro-stratus)

মধ্য-মেঘ দু'ধরনের

১. উচ্চ-স্তর মেঘ (Alto-stratus)
২. উচ্চ-পুঞ্জ মেঘ (Alto-cumulus)

নিম্ন-মেঘ তিন ধরনের

১. স্তর মেঘ (Stratus)
২. জলভরা স্তর-মেঘ (Nimbo-stratus)

৩. স্তর-পুঞ্জ মেঘ (Strato-cumulus)

মেঘের এই আট ধরনের ভাগ ছাড়া আরও দু'ধরনের মেঘের কথা আবহ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন।

১. পুঞ্জ-মেঘ (Cumulus)

২. পুঞ্জ-জলভরা মেঘ (Cumulo-nimbus)

মেঘের বিভিন্ন নামের মধ্যে নিম্বাস যেমন জলভরা, অলটো তেমনি উঁচু। ফলে নিম্বাস সত্যিই বৃষ্টি নামায় বা তুষারপাত ঘটায়। অলটো মধ্য-স্তরের উঁচু মেঘগুলোকে বোঝায়। এই মেঘ পুঞ্জ-মেঘ বা স্তর-মেঘও হতে পারে। পুঞ্জ-মেঘ বা পুঞ্জ-জলভরা মেঘ যেন উপরদিকেই বেড়ে চলে। যে কোনো উচ্চতায় এরা গঠিত হতে পারে আর কখনো কখনো এই মেঘের তলভাগ থাকে মাটি ছাড়িয়ে প্রায় ৪০০০ মিটার উপরে।

আকাশে এই যে মেঘের খেলা, এদের চিনলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কি নেই, তা খানিকটা বোঝা যায়, কিন্তু আবহ-বিদেরা সরাসরি এই মেঘের দিকে তাকিয়ে যে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন, তা নয়। আবহবিদেরা বসে আছেন এক জায়গায়। মাথার উপরে চোখ তুলে বা চারদিকে তাকিয়ে আর কতটুকুই বা মেঘ দেখতে পাওয়া যায়? তা ছাড়া সেই মেঘ দেখা আর কতটা সময়ের জন্যেই বা? অথচ যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রচার করা হয় হাওয়া আফিস থেকে, তাতে আগামী ২৪ ঘণ্টার কথা বলা থাকে। ফলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সরাসরি মেঘ দেখার খুব একটা ভূমিকা আছে বলা চলে না।

আমাদের দেশে বেশি বৃষ্টি হয় সাধারণত বর্ষাকালেই। সারা বছরে বৃষ্টিপাতের যদি একটা হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বৃষ্টি নামে ওই সময়ের দিনগুলিতে।

বৃষ্টি আর মেঘের খেলার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের রঙ বদলায়। তখন মেঘের বৈচিত্র্য আর রকমফের আমাদের নজরে আসে। নির্মেঘ বা মেঘ-ভরা সেই আকাশে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কতটা, মেঘের পরিচয় থেকে তার পূর্বাভাসের একটা হিসেব চলে। কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার সময়ে আবহ-বিজ্ঞানীরা নানা দিক দিয়েই চেষ্টা করে থাকেন।

পূর্বাভাস দেওয়া হয় কেমন করে

আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি চিন্তা স্থানীয় পূর্বাভাসকে কেন্দ্র করে। রোজ যাঁরা আফিস যান সকালবেলা আর সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরে আসেন, স্থানীয় পূর্বাভাস নিয়েই তাঁদের মাথাব্যথা। আর মজার কথা এই যে, বিভিন্ন ধরনের পূর্বাভাসের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এই স্থানীয় পূর্বাভাস নিয়েই সবচেয়ে বেশি।

আমরা তো বলি, আবহাওয়া আফিস যেদিন বৃষ্টি হওয়ার কথা বলে, সেদিন বৃষ্টি হয় না। আর যেদিন আবহাওয়া আফিসের কথা ধরে কাগজে লেখা হয়, আজ আকাশ নির্মেঘ থাকবে, সেদিন ঠিক বৃষ্টি নামে।

যাঁরা হাওয়া-আফিসে বসে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেন, তাঁরা কিন্তু এ-রকম কথায় খুশি হন না। হওয়ার কথাও নয়। তাঁরা বলেন, আমাদের কথা যদি না মেলে, যা বলি, ঠিক যদি তার উল্টোটাই হয়, তাহলে উল্টোটা ধরে চললেই তো পূর্বাভাস ঠিকমতো মিলে যাবে। সে-ও তো একরকমভাবে নির্ভুল পূর্বাভাস পাওয়াই বলা যায়।

কিন্তু ক'জন আর সেরকমভাবে পূর্বাভাস মিলিয়ে থাকেন? বা কতটাই সেরকমভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেলানো সম্ভব?

আবহাওয়ার পূর্বাভাস মানে আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কতটা, তা আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া।

স্থানীয় পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে স্থানীয় কথাটা থাকলে কি হবে, আমরা যেন কেবল আমাদের অঞ্চল বা আমাদের গ্রাম বা শহর-টুকুর কথাই না মনে করি। স্থানীয় পূর্বাভাস হলেও পূর্বাভাসের অঞ্চলটা যে একেবারে সামান্য মোটেই তা নয়। সেখানে হাওয়া আফিসকে কেন্দ্র করে ৩০ কিলোমিটার ঘেরের মধ্যে যে কোনো জায়গাই চলে আসবে। তাহলে কলকাতা যে স্থানীয় পূর্বাভাসের

খবর শোনায়, তাতে উলবেড়ে, সোনারপুর, বজবজ, সোদপুর, বস্তিবাটি এসে পড়বে। কিন্তু নিজের মাথার উপরে বৃষ্টি না হলে ক'জন আর বৃষ্টির পূর্বাভাস মিলেছে বলে মেনে নেবে ?

তা ছাড়া স্থানীয় পূর্বাভাসে যখন বলা হয়, বিকেলে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, তখন কিন্তু বৃষ্টি হবেই এমন কথা ধরে নেওয়া হয় না। বরং বৃষ্টির সম্ভাবনা সে সময়ে ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ এমনটাই মনে করা উচিত।

সত্যি কথা বলতে কি, আবহাওয়ার হালচাল অত্যন্ত জটিল। একই চেহারায় সে যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তা বলা যায় না। বরং এই আছি, এই নেইয়ের মত—অল্প সময়েই সে অভাবিত ভাবে বদলে যেতে পারে। ধরা যাক, কেউ প্রশ্ন করলো, একজন লোক এক ঘণ্টায় দৌড়ে কোথায় পৌঁছোবে ? এক কথায় এ প্রশ্নের কে উত্তর দেবে ? আগে জানা দরকার, যে দৌড়োচ্ছে সে কোনদিকে দৌড়োচ্ছে, কত জোরে ? কিন্তু এইটুকু জানলেই চলবে না। তার সঙ্গে জানতে হবে, কোথা থেকে সে দৌড়োতে শুরু করেছে ? অর্থাৎ তার বর্তমান অবস্থাটা। সেইজন্যে আবহাওয়ার এই মুহূর্তের খবর যতটা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়, সময় পার হতে থাকলে তা আর ততটা নিখুঁতভাবে বা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা সম্ভব নয়। কেউ যদি কোনো অঞ্চলের গত ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে, খুব সহজেই বলা যায়, তা দু'এক কথার ব্যাপার হবে না। কিন্তু আমরা ক'জন আর সে হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাবো ?

সাধারণভাবে আবহ-বিজ্ঞানীরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে কয়েক ভাগে ভাগ করেন। এর প্রথম ভাগটি হল স্বল্পকালীন পূর্বাভাস (Short range forecast)। স্বল্পকালীন যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়, তা ৪৮ ঘণ্টার জন্যে নির্দিষ্ট। এরপরে রয়েছে মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস (Medium range forecast), যার মেয়াদ তিন দিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। শেষ পর্যায়ের পূর্বাভাস

দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস (Long range forecast)। এর মেয়াদ সাধারণত ৬ মাস থেকে ৮ মাস।

কিন্তু যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দুইয়ে দুইয়ে চারের মত এক কথার ব্যাপার নয়। ১ যেমন ·০৯৯৯-এর সঙ্গে প্রায় সমান অথচ চুলচেরা বিচারে সমান বলা যাবে না, তেমনি আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে প্রায় কথাটা এসে থাকে।

কলকাতার আবহাওয়া আফিস থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। সে পূর্বাভাস প্রচার করা হয় খবরের কাগজে, আকাশবাণীও তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু এই পূর্বাভাসের জন্যে শুধু কলকাতা কেন্দ্র কাজ করে না। দেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণাগার এই পূর্বাভাস প্রচারে নিয়মিত খবর পাঠায়। আসাম এবং তার আশেপাশে যত রাজ্য আছে, যেমন, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড, সিকিম—প্রত্যেকটা জায়গা থেকে সেই অঞ্চলের আবহাওয়ার খবর আসে প্রত্যহ কলকাতার মূল কেন্দ্রে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জও খবর পাঠাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের দেশের ভেতর থেকেই যে শুধু খবর আসছে, তা নয়। আবহাওয়া দেশের সীমারেখা মানে না। ফলে দেশের ভেতরের নানা ঘটনার জন্যে দেশের বাইরেও তাকানো দরকার। সুতরাং আমাদের আবহাওয়া ঠিকমত জানার জন্যে দেশের বাইরে থেকেও খবর নিতে হচ্ছে।

সমস্ত ব্যাপারটা মাছ ধরা জালের মত একটা বিরাট বুনুনি। অনেক দূরে তা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু অনেক দূর বলে জালের ফুটো বড় করলে চলবে না। ফাঁকফোকড় দিয়ে কোনো খবর গলে না যায়, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। সেইজন্যে রাজ্যে রাজ্যে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রের মত জেলাতে জেলাতেও তা আছে। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলাতেই এ রকম কেন্দ্র পাওয়া যাবে এবং কোথাও কোথাও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা একের বেশি।

বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র যে যখন-তখন খবর পাঠাচ্ছে তা নয়। আকাশে মেঘ দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে টেলিপ্রিন্টারে খবর পাঠালাম বা টেলিফোন করে দিলাম, বা টেলিগ্রাম চলে গেল বা কাছাকাছি হল তো, লোক মারফৎ জানালাম, তা নয়।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন পর্যবেক্ষণাগার থেকে একই সময়ে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ নেওয়া হয় দিনে কয়েকবার। একে বলা হয় সমকালীন পর্যবেক্ষণ, Synoptic observation। এই সময়গুলি হল গ্রিনউইচ মান সময় অনুযায়ী ০-০, ০-৩, ০-৬ ··এইভাবে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর। তার ফলে ২৪ ঘণ্টায় এই রকম ৮টি পর্যবেক্ষণ নেওয়া হয়। এই গ্রিনউইচ মান সময়ের সঙ্গে ভারতীয় মান সময়ের তফাৎ হচ্ছে সাড়ে ৫ ঘণ্টা। সুতরাং ০-০ গ্রিনউইচ মান সময় হচ্ছে ভারতীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৫-৩০টা। ফলে ভারতীয় মান সময় অনুযায়ী ভোর ৫-৩০টা, বেলা ৮-৩০টা, বেলা ১১-৩০টা, বেলা ২-৩০টা, বিকেল ৫-৩০টা, রাত ৮-৩০টা, রাত ১১-৩০টা এবং রাত ২-৩০টা অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা বাদে বাদে পর্যবেক্ষণ নেওয়া হয়ে থাকে এবং সেগুলি আবহাওয়ার মানচিত্রে অঙ্কন করা হয়।

তাহলে ২৪ ঘণ্টার হিসেবে পর্যবেক্ষণ নেওয়া হয় দিনে ৮ বার এবং এর মধ্যে তুটি পর্যবেক্ষণকে মূল পর্যবেক্ষণ সময় বলা হয়। এই তুটি সময়কাল হল সকাল ৮-৩০টা এবং বিকেল ৫-৩০টা। এই তুটি সময়ে আবহাওয়া বিভাগের যতগুলি স্থায়ী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে, তা থেকে পর্যবেক্ষণ তো নেওয়া হয়ই, তা ছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় পর্যবেক্ষণাগার থেকে খবর আসে। এ সব পর্যবেক্ষণাগার হল Departmental and part time observatory। এই সব আংশিক সময়ের কেন্দ্র বনবিভাগ, সেচবিভাগ, রেলবিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু অন্যান্য সময়ে কেবল বিভাগীয় পর্যবেক্ষণাগারগুলিই খবর পাঠিয়ে থাকে। তাহলে সকাল সাড়ে ৮টায় আর বিকেল সাড়ে ৫ টায় পর্যবেক্ষণের সংখ্যাই বেশি। আর এই তুটি পর্যবেক্ষণ চার্টকেই মূল চার্ট হিসেবে

ধরা হয়। কারণ এ রকম জাল অনেক বেশি ছড়ানো, ছাঁদাও ছোট—এ রকম জালের উপরে নির্ভর করা যায় স্বচ্ছন্দে। সকাল সাড়ে ৮ টার চার্টের উপর ভিত্তি করে যে পূর্বাভাস তৈরি করা হয় তা আকাশবাণী প্রচার করে দুপুর আড়াইটায় আর বিকেল সাড়ে ৫টার পূর্বাভাস রাতে ও পরের দিন সকালে।

পূর্বাভাস দেওয়ার বেলায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই খবর আসতে শুরু করে মূলকেন্দ্রে। টেলিগ্রাফ খবর পাঠায়,বেতারে খবর আসছে, টেলিপ্রিন্টারে খবর দিচ্ছে। সেখানে ওই তথ্যগুলি একটি মানচিত্রে অঙ্কিত করা হয় সাংকেতিক ভাবে। চোখের সামনে একটি মানচিত্র, তা থেকে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। লিপিবদ্ধ করা বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে থাকে আকাশে কতটা মেঘ আর কি কি মেঘ আছে, নীচু মেঘ কতখানি, সে মেঘের উচ্চতা কত, খালি চোখে কতটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বায়ুর গতিবেগ, আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা, এক ঘণ্টা আগে থেকে এর আগের পর্যবেক্ষণ নেওয়ার সময় পর্যন্ত আবহাওয়া কেমন ছিল, বৃষ্টিপাত যদি হয়ে থাকে তো কতটা হয়েছে, বায়ুর তাপমাত্রা, চাপমাত্রা, কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প হাওয়ায় আছে, গত ২৪ ঘণ্টায় বায়ুর চাপ কতটা বেড়েছে বা কমেছে প্রভৃতি।

এগুলি ছাড়াও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে আরও কিছু কিছু জরুরি তথ্যের প্রয়োজন হয়। সেগুলি হল বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুর গতিবেগ, তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। এই সব তথ্যের মধ্যে কেবল আকাশের উপরের স্তরে বায়ুর গতিবেগ মাপার জন্যে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি রাবার বেলুনেও কাজ চলে। একটা হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি রাবার বেলুন আকাশে ছেড়ে দিলে তা একটা নির্দিষ্ট গতিতে উপরে উঠতে থাকে। থিওডোলাইট নামে দূরবীনের মত একটা যন্ত্র আছে। বেলুনটি যখন আকাশে উঠতে থাকে তখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওই যন্ত্রটির সাহায্যে প্রতি মিনিটে বেলুনের অবস্থান হিসেব করা হয়। ওই অবস্থান হিসেবের সময়ে

দেখা দরকার, বেলুনটি দিকচক্রবাল থেকে কত ডিগরি উপরে আছে এবং উত্তর দিকের সঙ্গে কত ডিগরি কোণ করে রয়েছে। প্রতি মিনিটে এই দুটি কোণের পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে বেলুনটির ওপর দিকে ওঠার গতিবেগ জানতে পারলে জ্যামিতিক উপায়ে বায়ুর বিভিন্ন স্তরের গতিবেগ নির্ণয় করা কঠিন নয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে বেলুনটির ওঠার গতিবেগ বরাবর সমান থাকে না। ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতের মধ্যে পড়লে বেলুনটি উঠে যাবে তাড়াতাড়ি, না হলে নয়।

বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী গতিস্রোতের কারণ বাতাসের এই পরিচলন প্রক্রিয়া। এই পরিচলন প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠদেশের বাতাস উষ্ণ হওয়ার ফলে হালকা হয় এবং ঊর্ধ্বমুখে উঠে যায় আর তখন চারপাশের ভারি বাতাস শূন্য স্থান পূরণের জন্যে সেই জায়গায় ছুটে আসে। দুপুরের দিকে বাতাস যখন উত্তপ্ত, তখন বায়ুমণ্ডলে পরিচলন স্রোত থাকে অর্থাৎ একটা ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতও। আর হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি বেলুনটি ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোতে পড়লেই তাড়াতাড়ি উঠবে উপরের দিকে।

তাহলে তখন বেলুনটির গতিবেগ মাপা হবে কেমন করে? অনেক ঘুড়ির সঙ্গে যেমন লেজ থাকে, তেমনি তখন বেলুনের সঙ্গে লেজ জুড়ে দেওয়া হয়। থিওডোলাইট এই লেজেরও কৌণিক পরিমাপ নেবে প্রতি মিনিটে। আর তার ফলে বেলুনটি পরিচলন স্রোতের মধ্যে রইলেও তার বিভিন্ন স্তরের গতিবেগ হিসেব করা যায় সহজে।

তবে হাইড্রোজেন বেলুন নিয়ে কাজ করারও অসুবিধা আছে। আকাশে যদি নীচু মেঘ থাকে, তাহলে কি হবে? তখন তো গ্যাস ভর্তি বেলুনটা লক্ষ্য করা যাবে না সহজে। বৃষ্টি হলেও অসুবিধা।

এইসব অসুবিধা দূর করার জন্যে আবহ-বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন। সঙ্গে আর এক ধাপ অগ্রগতি। বিরাট আকারের

হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি বেলুনের সঙ্গে এক রকমের যন্ত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এর নাম Radiosonde। বেলুনটি যখন আকাশে উড়ে চলে যেতে থাকে, তখন বেলুন সংলগ্ন বেতারযন্ত্র মারফৎ ওই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ভূ-পৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পৌঁছোয় এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। সারা ভারতে এইরকম রেডিওসোন্‌ডে কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতিদিন ভোর ৫-৩০ ও বিকেল ৫-৩০ টায় বেলুন ছাড়া হয় ও সাধারণ অবস্থায় দিনে তু'বার বিভিন্ন উচ্চতায় প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পাওয়া যায়। আবহাওয়া খারাপ থাকলে বা সাইক্লোন ঝড় আসছে এমন অবস্থা হলে এই পর্যবেক্ষণগুলি দিনে চারবার করে নেওয়া হয়।

এই রেডিওসোন্‌ডে যন্ত্র রায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত আধুনিক এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। রেডিওসোন্‌ডে বিভিন্ন ধরনের আছে, তবে এর মূল কথা হল, সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যকে এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিত্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে এবং বেতারযন্ত্রের সাহায্যে সে খবর ভূ-পৃষ্ঠের কেন্দ্রে এসে পৌঁছোয়। এ যেন অনেকটা আমাদের চরিত্রের মতন চরিত্র বিশ্লেষণ। কিন্তু আমাদের চরিত্র তো আর দিন দিন বা ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না। আবহাওয়া চঞ্চলমতি, মুহূর্তেই তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধরে রাখা যায় না।

বিভিন্ন তথ্য মানচিত্রে সাংকেতিক ভাবে অঙ্কিত করার পরে যে সব জায়গায় বায়ুর চাপ সমান, তাদের একটি রেখার সাহায্যে যুক্ত করা হয়। এই রেখার উপরে সব জায়গায় বায়ুর চাপ সমান বলে একে বলা হয় সমচাপ রেখা। ইংরেজিতে সমচাপ রেখাকে আমরা বলি Isobar। সমচাপ রেখা টেনে উচ্চচাপ অঞ্চলকে নিম্নচাপ অঞ্চল থেকে আলাদা করা যায়। নিম্নচাপ অঞ্চলে সমচাপ রেখার মধ্যে এমন সমচাপ রেখা পাওয়া যায়, যার মান সবচেয়ে কম। এই নিম্নচাপ অঞ্চলকে ঘিরে আরও সমচাপ রেখা টানা হয়, যার মান ক্রমশ বাড়তে থাকে। আবহাওয়ার মানচিত্রে

এক একটা নিম্নচাপ ভালভাবে বোঝার জন্যে একটা ক্লাসের বিভিন্ন মেধার ছেলেদের কথা ধরা যেতে পারে। ক্লাসে যাদের সবচেয়ে খারাপ ছেলে বলে মনে করা হয় তারা যেন বিভিন্ন নিম্নচাপ রেখার মধ্যে এমন নিম্নচাপ রেখা, যার মান সবচেয়ে কম। তাহলে তাকে ঘিরে সাজানো যেতে পারে সমান মেধার বিচারে বিভিন্ন ছাত্রের দল। তাহলে একটা ছাত্রের দলকে ঘিরে রয়েছে তার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ের উন্নত ছাত্রের দল। আবার সেই মেধার ছাত্রের দল ঠিক উপরের মেধার দলের বাঁধনে বন্দী। নিম্নচাপের চেহারাটা অনেকটা ওইরকমই। ঘুরপাক খাওয়া এক একটা ঘূর্ণির মত।

চাপ নিয়ে যেমন সমচাপ রেখা, তেমনি তাপকে নিয়ে সমতাপ রেখা আর বৃষ্টিকে নিয়ে সমবৃষ্টি রেখাও টানা যায়। সমতাপ রেখাকে বলা হয় isotherm এবং সমবৃষ্টি রেখাকে isohyete।

এইভাবে মানচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, কাছাকাছি কোথাও কোনো আবহাওয়া প্রণালী তৈরি হল কিনা। আবহাওয়া প্রণালীকে বলা হয় weather system। যদি সত্যিই কোনো আবহাওয়া প্রণালী তৈরি হয়, তাহলে দেখতে হবে সে প্রণালী গত দু'তিন দিন ধরে কোনদিকে সরে যাচ্ছে। এইভাবে একটা ধারণা করা হয়, আগামী দু' একদিনে এই আবহাওয়া প্রণালী কোনদিকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয় সেইদিকেই। আবহাওয়া প্রণালীটি যত প্রবল হবে, বৃষ্টিপাতও তত বেশি হওয়ার আশঙ্কা।

রাডার ও এ পি টি

ঝড়-জলের পূর্বাভাসে রাডারের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কিন্তু আবহাওয়ার প্রয়োজনে তার আবিষ্কার বা উদ্ভাবন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থান নির্ধারণের জন্যে রাডারের ভূমিকাটা বাস্তবে লক্ষ্য করা গেল। অসাধারণ এর উপযোগিতা। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্র থেকে একে আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে নিয়ে আসার কথা প্রথম বললেন ইংল্যাণ্ডের জেনারেল ইলেকট্রিক গবেষণাগারের জে ডবলিউ রাইড ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ঘোষণা করলেন, রাডার মেঘের অস্তিত্বও নির্দেশ করতে সক্ষম হবে। এই ঘোষণার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে প্রথম রাডারের পর্দায় ঝড় বয়ে নিয়ে আসছে, এমন একটা মেঘের প্রতিবিম্ব ধরা পড়লো। সেই শুরু, তারপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আবহাওয়া কেন্দ্রগুলিতে রাডারের ব্যবহার চলে আসছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের এক বিশেষ অবলম্বন হিসেবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পরে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর যুদ্ধের উদ্বৃত্ত থেকে বিমান সংকেতের প্রয়োজনে তৈরি কয়েকটি রাডার সংগ্রহ করলেন। প্রথম দিকে সংগৃহীত রাডার একেবারে আদিযুগের রাডার। ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে এগুলির তেমন কোনো উপযোগিতা ছিল না। কিন্তু আবহমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বাতাসের গতি এবং দিক নির্ণয়ের জন্যে যে সব আবহাওয়া বেলুন ছাড়া হত, মেঘলা আকাশে এবং দৃষ্টির আড়ালে তাদের হালচাল বোঝার সময়ে এই রাডারগুলি খুব কাজে দিত। কিন্তু দিন যতই এগোতে থাকলো, তত যুদ্ধের উদ্বৃত্ত আরও বেশি করে পাওয়া গেল। তখন ঝড়ের অস্তিত্ব নির্ধারণের উপযোগী রাডারও পাওয়া সম্ভব হল।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এল প্রথম ৩ সেন্টিমিটার রাডার, তারপর ১০

সেন্টিমিটার রাডার কয়েকটি। এই সব রাডারের প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু এরই সাহায্যে ধীরে ধীরে কাজ শুরু হল।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর Decca—৪১ শ্রেণীর একটি ৩ সেন্টিমিটার রাডার দমদম বিমান বন্দরে বসান। ২০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত ঝড়ের অস্তিত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল এই যন্ত্রটির। নিঃসন্দেহে ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বাভাসে এর ভূমিকাটা অস্বীকার করা যায় না। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এই রাডারের জায়গায় বসানো হল আরও শক্তিশালী একটি জাপানি রাডার। ঝড়ের অস্তিত্ব নির্ধারণে এর ক্ষমতা আরও বেশি। ৩০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত এ কার্যকর ছিল। তারপর একে একে ৩ সেন্টিমিটার ঝড়-নির্দেশক রাডার বসে ভারতের বিভিন্ন স্টেশনে। সর্বমোট ১০টি স্টেশনকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই স্টেশনগুলি হল নিউ দিল্লী, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, নাগপুর, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, গৌহাটি, আগরতলা এবং মোহনবাড়ি। এইসব স্টেশনের মধ্যে হায়দ্রাবাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে প্রথম ভারতে নির্মিত ঝড়-নির্দেশক রাডার ব্যবহৃত হয়। ৩ সেন্টিমিটার রাডারের একটা অসুবিধা এই যে, এই ধরনের রাডারে সাইক্লোন ঝড়ের গতিবিধি ঠিক বোঝা যেত না। সাইক্লোন ঝড়ের সঙ্গে যে প্রবল বর্ষণ হত, তার বৃষ্টির ফোঁটাগুলোর আকার সাধারণ ঝড়-ঝঞ্ঝার তুলনায় বড় ছিল বলে ৩ সেমি রাডারে তা ঠিকমতো ধরা পড়তো না। ফলে বিশেষ উন্নত ধরনের ১০ সেন্টিমিটার রাডারের প্রয়োজন হল। ক্রমে ক্রমে হলও তা। সেরকম রাডার প্রথম স্থাপিত হয় বিশাখাপট্টমে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে।

এ কথা ঠিক সাইক্লোন ঝড় কোনোভাবে ঠেকানো যাবে না, কিন্তু পূর্বাভাস ঠিকমতো মিললে সতর্ক তো অনেকটাই হওয়া সম্ভব। তাতে ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যায়—পুরোটা না হলেও যে বেশ কিছুটা, এ

সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আবহ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এ দেশে সাইক্লোন ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে ধারাবাহিক-ভাবে উন্নতি হয়ে চলেছে।

আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে এ দেশে ঝড় সম্পর্কে সতর্ক করার কাজ শুরু করা হয় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। খুব বড় উদ্যোগ-আয়োজন কিছু নয়। সতর্ক-বার্তা পাঠানো হত কলকাতার বন্দরে। কিন্তু সেই শুরুর অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত উন্নতি কম হয়নি। এখন ভারতের বিভিন্ন আবহাওয়া আফিসের সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি—দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক নিমেষের জন্যেও অবকাশ নেই। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই—ভারতের সমুদ্র-কূলবর্তী তিন আবহকেন্দ্র অতন্দ্র প্রহরীর মত—সমস্ত উপ-মহাদেশে এবং সমুদ্র অঞ্চলে দৃষ্টি রেখেছে, কোথাও কোনো ঝড়ের সংকেত পাওয়া গেলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে 'সেই বার্তা রটি যাবে ক্রমে'।

জরুরিকালীন টেলিগ্রাম পাঠানো হবে বন্দরে, জেলে নৌকোয়, রেল কর্তৃপক্ষের কাছে, ডাক ও তার বিভাগে, কৃষি দপ্তরে। সমুদ্র-বুকে যে সব জাহাজ ভাসমান তটভাগ থেকে বেতারে সেখানে খবর ছোটে। আর জনসাধারণ খবর পায় বেতারে এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে। কোনো কোনো জেলাতে পুলিশি বেতারেও খবর যায়।

সাইক্লোনের খবর সবচেয়ে বেশি দরকার সমুদ্র তটবর্তী মানুষের আর সমুদ্রের গভীরে যে সব জাহাজ পাড়ি দিয়েছে তাদের জন্যে। সাইক্লোনের অবস্থান কোথায়, সে কোনদিকে সরে চলেছে এবং কি রকম তার শক্তি সময়মতো জানতে পারলে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। সাধারণভাবে সাইক্লোনের সৃষ্টি সমুদ্রের বুকে বলে যে সব জাহাজ সাইক্লোনের গতিপথের উপরে আছে বা গতিপথের উপরে এসে পড়বে, বিপদের আশঙ্কা সবচেয়ে তাদেরই বেশি। সাইক্লোন সমুদ্রতটের দিকে এগিয়ে আসছে অথচ পাড়ের কাছাকাছি জাহাজগুলিও তার খবর পেল না, সতর্ক হওয়ার আগেই সাইক্লোন এসে আছড়ে পড়লো, তাহলেও বিপদ।

সাইক্লোনের খবর এবং পূর্বাভাস সময়মতো পাওয়া দরকার সমুদ্রের বুকের উপরে ভাসমান জাহাজের সঙ্গে সমুদ্র তটের সাধারণ মানুষের। যদি সাইক্লোন সত্যিই প্রবল আকার ধারণ ক'রে এগিয়ে আসে, তাহলে তা থেকে যে বিপদ দেখা দেবে, তা আসবে তার চূড়ান্ত ভয়াবহ রূপ ধরে। সেখানে মানুষ যে কত অসহায়, তা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

১৩ সেন্টিমিটার উন্নত এবং শক্তিশালী রাডার আবহ-বিজ্ঞানীদের কাছে এক মস্ত বড় হাতিয়ার যা সাইক্লোন ঝড়ের অবস্থান এবং গতিপথ নির্ধারণের ব্যাপারে বিশেষ রকম সাহায্য করবে। অনুকূল অবস্থায় এরা ৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করার ক্ষমতা রাখে।
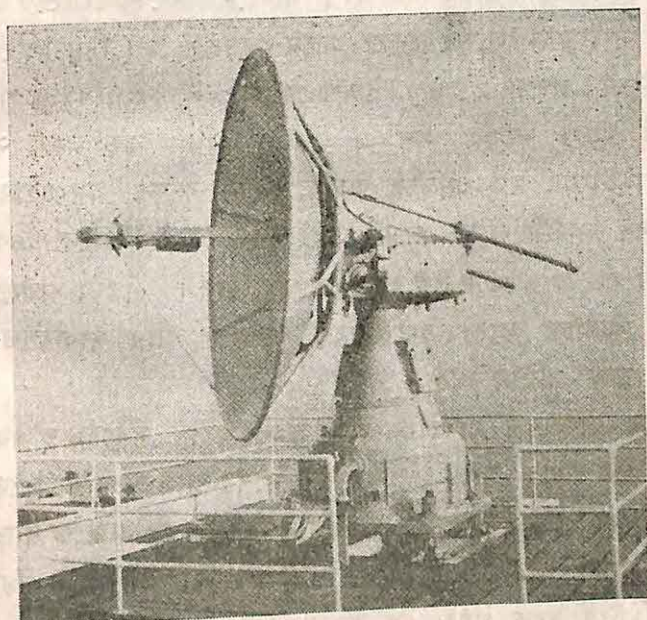
রাডারের অ্যান্টেনা ব্যবস্থা

রাডারের পর্দার সাইক্লোন ঝড় প্রতিধ্বনি তোলার মত কাজ করে। যখন কোনো সাইক্লোন রাডারের দিকে এগিয়ে আসে,

ঝড়-ঝঞ্ঝা নির্দেশ করতে পারে রাডারে এমন প্রতিধ্বনির ছাপ পড়ে। এই প্রতিধ্বনির ছাপ পড়ে কি ভাবে? রাডার থেকে বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ (তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ) জলবিন্দুর উপরে প্রতিফলিত হয়ে আবার রাডারে ফিরে আসে। ব্যাপারটা যেন, বাড়ি থেকে কেউ বেরোল, সোজা পথে এগিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এল। যাতায়াতে যতটা সময় লাগলো তার হিসেব রাখা হল। আর তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ জানা আছে। ফলে ঝড় কতদূরে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সমস্ত ঘটনাটা প্রতিধ্বনির সাহায্যে দূরত্ব ঠিক করার মতনই। এখানে একটা কথা বলা দরকার। রাডারকে সাইক্লোনের দৃষ্টিপথে সরাসরি রাখতে হবে। তাই তাকে বসাতে হয় কলকাতার New Secretariat—এর মত উঁচু বাড়ির মাথাতেই। প্রতিধ্বনির এই ছাপ সাইক্লোন ঝড়ের কেন্দ্রের ছাপ নয়। সাইক্লোন ঝড়ের কেন্দ্র মানে ঝড়ের চোখ (নিম্নচাপ ক্ষেত্র ও সাইক্লোন অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। চোখ থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে থাকা ঝড়ের অংশ এ হতে পারে। ঝড় যখন ২০০ কিলোমিটারের মত এগিয়ে আসে, তখন ঝড়ের যে চেহারাটা রাডারের পর্দায় ফুটে ওঠে, তা অনেকটা প্যাঁচানো একটা বেষ্টনীর মত, যার কেন্দ্রটাই হচ্ছে ঝড়ের চোখ। একটা সাইক্লোন ঝড়ের সচরাচর দুটো তিনটে বেড় থাকে। আর সাধারণভাবে ঝড়ের চোখ প্রতিধ্বনিমুক্ত।

তবে রাডারের সাহায্যে ঝড় লক্ষ্য করার সময়েও দু'একটা বিষয়ে কথা বলার আছে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, একটা ঝড়ের উপরে ১০০ ভাগ নজরদারি করার জন্যে রাডার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। রাডারের সীমা নির্দিষ্ট। ৩০০/৪০০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত সে যতটা যথাযথ কাজ করতে পারে, তাতে সাইক্লোন ঝড়কে তার উৎপত্তির পর্বে দেখা সম্ভব নয়। রাডারে যখন তাকে লক্ষ্য করা যায়, তখন সে প্রায় দ্বারপ্রান্তে। এসে পড়লো বলে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তার দেখা পাওয়ার কথা।

তাহলে সাইক্লোন ঝড়ের খবর তার উৎপত্তির সময়ে পাওয়ার জন্যে তাকে অনেক আগে থেকেই দেখা দরকার। সমুদ্রের গভীরে উৎপত্তির মুহূর্তেই তাকে চিনতে হবে। এ কাজ রাডারের নয়। এ জন্যে মহাকাশ থেকে নিয়মিত এবং নিয়ম মতো তাকে লক্ষ্য করা চাই।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল আমেরিকা একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। এই উপগ্রহ উত্তর-দক্ষিণে বা দক্ষিণ-উত্তরে চলতো অর্থাৎ দুই মেরুর উপর দিয়ে এ পাক খেত। কিন্তু পৃথিবীকে ফিরে পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ অক্ষাংশ বরাবর এতে ঘোরার
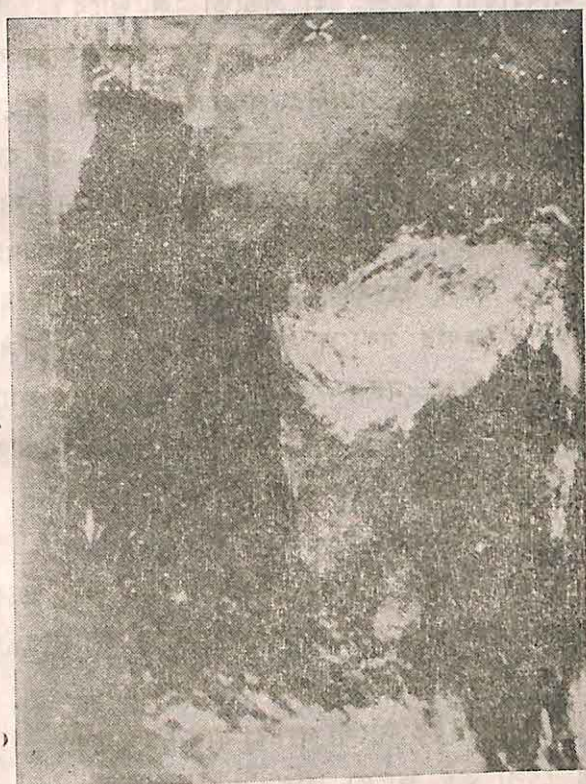
এপিটিতে তোলা দেশের পূর্বাঞ্চলের সাইক্লোনের ছবি

কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে এর উচ্চতা ৬০০ থেকে

১৬০০ কিলোমিটারের মত এবং পৃথিবীর চারদিকে এর পাক দিতে সময় লাগতো প্রায় ১০০ থেকে ১১০ মিনিট। এই উপগ্রহে শক্তিশালী ক্যামেরা লাগানো আছে। ক্যামেরা আছে উপগ্রহের নিচের অংশে—ভূপৃষ্ঠের দিকে তার মুখ। পৃথিবীকে পাক দেওয়ার সময়ে ক্যামেরা ছবি তোলে প্রতি দু'মিনিট অন্তর। এই ছবি আমাদের ভূ-পৃষ্ঠের ছবি। সে ছবিতে কোথাও আসছে সাগর, মহাসাগর, কোথাও ফুটে উঠছে আমাদের দেশের সীমারেখা, কোথাও আবার ভূ-পৃষ্ঠের উপরে মেঘের রূপ-বৈচিত্র্য—আবহাওয়ার পূর্বাভাসে যার অসামান্য ভূমিকা থেকে যায়। কিন্তু সে ছবি পৃথিবীর আবহাওয়া কেন্দ্রে ধরা পড়তো কি ভাবে? উপগ্রহ ছবিটিকে বেতার-তরঙ্গে পরিণত ক'রে ভূ-পৃষ্ঠের আবহকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয় বেতারের মাধ্যমে। পৃথিবীর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সে বেতার-তরঙ্গ আবার চিত্রে বদলে নেবার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার নাম Automatic Picture Transmission Unit। সংক্ষেপে একে বলা হয় APT। এই ধরনের মেরু প্রদক্ষিণকারী আবহাওয়া উপগ্রহগুলি ২৪ ঘণ্টার হিসেবে কোনো স্থানের উপর দিয়ে দিনে দু'বার যায়। একবার সকালে আর একবার রাতে। সকালে ছবি তোলার অসুবিধা নেই। তখন ছবি ওঠে সূর্যের আলোতে আমাদের ঘরোয়া ক্যামেরার মত। আর রাতের ছবি তোলা হয় অবলোহিত (Infra-red) আলোর সাহায্যে।

অবলোহিত আলো কি?

সূর্য-রশ্মি যে সাতটা দৃশ্য রঙে ভেঙ্গে ফেলা যায়, তার এক প্রান্তে আছে লাল রঙ। এই লালের প্রান্ত ছাড়িয়ে আছে অবলোহিত আলো। খালি চোখে এ দৃষ্টিগোচর নয়।

কিন্তু এই অবলোহিত আলো পাওয়া যায় কি ভাবে?

রাতের বেলা এই আলো তাপরশ্মির চেহারায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে। বোম্বাইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তর থেকে এই উপগ্রহ মারফত পাঠানো ছবি গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। উপগ্রহ মারফত পাঠানো এই ছবি সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের রাডার স্টেশনের অনেক আগেই সাইক্লোনের পূর্বাভাস দিতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আমেরিকা প্রথম যে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করে তার নাম ছিল TIROS-1। ইংরেজি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হল Television and Infra-red Observation Satellite। কিন্তু প্রাথমিক যাত্রার পরে প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে ধারাবাহিক আবহাওয়া উপগ্রহের উন্নতি ঘটে চললো।

১৯৭০-এ এল NOAA। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার উপর দিয়ে এ পৃথিবীকে আবর্তন করে চলেছে, প্রতিটি আবর্তনের সময়কাল ১১৫ মিনিট। দিনে-রাতে সমস্ত পৃথিবীকে একাধিকবার দেখা ছাড়াও এই রকমের উপগ্রহ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এবং উপগ্রহের মধ্যে বিভিন্ন উচ্চতার তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পাঠাতো। তা থেকেই বিশ্লেষণ করে বোঝা যেত কোথায় আছে মেঘ, কোন উচ্চতায়, ভূ-ভাগের তাপমাত্রা কি রকম, সমুদ্রের বুকের উপরেই বা সে তাপমাত্রা কতটা—এ ধরনের সব খবরাখবর।

NOAA-এর প্রায় ন'বছর বাদে এল TIROS-N ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। পৃথিবী থেকে এর গড় উচ্চতা ছিল প্রায় সাড়ে আটশো কিলোমিটার এবং এ একটি আবর্তন সম্পূর্ণ করতো প্রায় ১০২ মিনিটে। এই উপগ্রহ দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নিরক্ষরেখাকে অতিক্রম করে যেত।

ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে Nimbus পর্যায়ের উপগ্রহগুলির কাজ। আরও সূক্ষ্ম প্রযুক্তি-সম্ভাবনা এবং প্রগতিই এর লক্ষ্য। প্রায় মেরু প্রদক্ষিণকারী এই উপগ্রহের কাজ শুরু হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। Nimbus-1 তার যাত্রার প্রাক্কালেই একটা হারিকেনের হদিশ পায়। সেই সঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তার প্রভূত সম্ভাবনার দিকটিও তুলে ধরে।

এর পরে এল ভূসমলয় উপগ্রহের যুগ। মেরু প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধে লক্ষ্য করা গেল। প্রথমত অধিকাংশ জায়গার ক্ষেত্রে এ মাত্র দিনে দু'বার ছবি তোলে। তাহলে স্বল্পকালীন পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো সুযোগ এ ধরনের উপগ্রহের নেই। তার উপরে এই ধরনের উপগ্রহের কক্ষপথে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাতাসের গতিবিধি নিয়ে তেমনভাবে পর্যালোচনার সুযোগ ছিল না। অথচ আমাদের আবহাওয়ার ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের ভূমিকাটা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এইসব অসুবিধার অনেকটাই অতিক্রম করে আসা সম্ভব ভূসমলয় উপগ্রহের সাহায্যে। নিরক্ষরেখার প্রায় ৩৬০০০ কিলোমিটার উপরে স্থাপিত এই ভূসমলয় উপগ্রহগুলি। এই ধরনের উপগ্রহগুলি এমনই যে, ভূ-পৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে এদের অবস্থান মোটামুটি নির্দিষ্ট। অনেক উপরে থাকার জন্যে এই উপগ্রহগুলি একটা বিরাট অঞ্চলের ছবি তুলতে পারে। তা ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেতার-সংকেত পাঠিয়ে যখন খুশি এই ছবি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে এবং আরব সাগরে যখন সাইক্লোন ঝড় সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে তটভূমির দিকে অগ্রসর হয়, তখন কোথায় এই ঝড়টি আছড়ে পড়বে, এটি জানা বিশেষ দরকার। কারণ সেই অঞ্চলের লোকজনকে প্রচণ্ড ঝড় এবং সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাসের জন্যে সতর্ক করা একান্ত প্রয়োজন। এই সময়ে INSAT উপগ্রহগুলি থেকে পাঠানো ছবি অমূল্য সম্পদ।

মানুষের দুরতিগম্য এমন সব জায়গায় আবহাওয়ার খবর পাঠায় INSAT। মহাসমুদ্র, মেঘের চুড়ো, তুষার-আচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী—এই পর্বের উপগ্রহের দৃষ্টি গেছে সর্বত্র। ফলে ঝড়, জল, সাইক্লোন এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংগ্রহ করা সম্ভব সহজে।

১৯৮২-এর এপ্রিলের গোড়ায় যাত্রারম্ভ হয় Indian National Satellite—INSAT-1A-এর। এটি ডেলটা ৩৯১০ রকেটের সাহায্যে

কেপ ক্যানাভেরাল থেকে উৎক্ষিপ্ত হল। কিন্তু অকালে এটির মৃত্যু ঘটে। তবু এই উপগ্রহটি কিছু কিছু খবর যে পাঠায়নি তা নয়।

ইতিমধ্যে Insat-1B পরিকল্পনা মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যায়। দিনে ১০টি ছবি আসছে—সূর্যালোক এবং রাতের অন্ধকার মিলিয়ে। প্রয়োজনে আরও বেশি। ১৯৮৩-এর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় উৎক্ষিপ্ত হবার পরে এ প্রথম টি ভি ছবি পাঠায় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। কিন্তু পুরোপুরি কার্যকর হতে আরও মাসখানেক লেগে যায়।

নিম্নচাপ ক্ষেত্র ও সাইক্লোন

বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নিম্নচাপ কথাটার খুব যোগাযোগ দেখা যায় কাগজের পাতায়। যে অঞ্চলে বাতাসের চাপ অন্য অঞ্চলের তুলনায় কম, সেই অঞ্চলই নিম্নচাপ অঞ্চল। কিন্তু তার সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক এল কেমন ক'রে ?

আমরা জানি মেঘ সৃষ্টি হয় বাষ্পীভবন হ'য়ে। কেটলির জল ফুটে ফুটে শেষ হয়ে যায়। এ বাষ্পীভবনেরই ফল। তা ছাড়া জল গরম করবার সময়ে নীচে যে জল থাকে, তাপের ফলে আয়তন বেড়ে তা অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে উপরে ওঠে। আর সেইজন্য উপরের স্তরের জল নীচে নেমে আসে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই জলও গরম হয়ে উপরে উঠে উপরের জলকে নীচে পাঠিয়ে দেয়। এই যে নীচের জল হালকা হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে আর উপরের জল নীচে নেমে এসে সেই জায়গা নিয়ে নিচ্ছে—এই প্রক্রিয়াকে বলে পরিচলন প্রক্রিয়া। জলের মত বায়ুমণ্ডলেও এই পরিচলন প্রক্রিয়া কাজ করে চলে। সেইজন্যে নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ুস্রোত নীচ থেকে উপরে উঠে যায় আর উচ্চচাপ অঞ্চলের বায়ুস্রোত উপর থেকে নীচে নেমে আসে।

বায়ুমণ্ডল জলের মত হলে ভূ-পৃষ্ঠ আঁচ দেওয়া উনুনের মত। ভূ-পৃষ্ঠে পিঠ দেওয়া বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়ে পরিচলন পদ্ধতিতে উপরে ওঠে। কিন্তু কেটলিতে জল গরম করার সময়ে উপরের জল যেমন নীচে নেমে আসে, তেমনি খানিকটা পথ ঘোরার পরে সেই বায়ুও নিম্নগামী হয়।

এখন মেঘ সৃষ্টি হয় কেমন ক'রে ?

যত উপরে ওঠা যায়, ততই ঠাণ্ডা। যে জল বাষ্পীভবনের ফলে হালকা হয়ে উপরে উঠে গেল, ঊর্ধ্বাকাশে যত অসংখ্য কণা ভেসে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, তাদের অবলম্বন ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু তৈরির সাহায্যে তা সৃষ্টি করলো মেঘ।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার রইলে কি হবে? অর্থাৎ ইতস্তত যত অসংখ্য কণা ভেসে বেড়াচ্ছে বায়ুমণ্ডলে, মেঘ তৈরিতে যাদের ভূমিকাটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, তারা যদি বায়ুমণ্ডলে না থাকে, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? তখন কেমন ক'রে সৃষ্টি হবে মেঘ? না কি আকাশে তখন মেঘের দেখা পাওয়া যাবে না? সে সময়ে আকাশ রইবে নির্মল, নির্মেঘ, বরাবর শরতের নীল আকাশের মত?

বায়ুমণ্ডল যদি একেবারে নির্মল হয়, কোনো ধূলিকণা নেই কোথাও, যত রকমের রাসায়নিক পদার্থ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে থাকে, তারাও সব অদৃশ্য, তা ছাড়া লবণের ক্ষুদ্র কণাদের পাওয়া যাচ্ছে না—এ রকম অবস্থায় জলকণারা কি তৈরি হবে না?

হবে না, এমন নয়। কিন্তু তার জন্যে বাতাসের আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকা দরকার। দেখা গেছে, জলকণার ব্যাসার্ধ $১০^{-৭}$ সেন্টিমিটার হওয়ার জন্যে বাতাসের আর্দ্রতা ৩২০% না হলে চলে না। যখন বৃষ্টির আরও বড় বড় ফোঁটা তৈরি হয় অর্থাৎ $১০^{-৫}$ সেন্টিমিটারের মত বড় ব্যাসার্ধের জলকণার জন্যে বাতাসের আর্দ্রতা অন্তত ১১০% হওয়া চাই।

কিন্তু সাধারণ বাতাসে এতটা বেশি আর্দ্রতা তৈরি হয় না। আবার এর চেয়ে কম আর্দ্রতায় জলীয় বাষ্পই দ্রবীভূত হয় না। তাহলে মেঘ হয় কেমন ক'রে?

আসলে বাতাসের ধূলিকণা আর ভেসে বেড়ানো বিভিন্ন রকম পদার্থই মেঘ তৈরির কারণ। সমুদ্রের উপরের বায়ুমণ্ডলে লবণের কণা থাকে প্রচুর পরিমাণে। ফলে এই লবণের কণার উপস্থিতিতে শতকরা ৭৮ ভাগ আর্দ্রতাতেই মেঘ তৈরি হয়।

সাগর মহাসাগরের উপরের বাতাসে লবণ কণা এবং অন্যান্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের কণার সংখ্যা ১০ লক্ষের মত। শহরে এই সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। সেখানে এর সঙ্গে যোগ হয় ধূলিকণার। শহরের চারপাশে কল-কারখানার সংখ্যা কম নয়।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন দূষিত পদার্থ বাতাসে মিশে যাচ্ছে। ফলে বাতাসে বিভিন্ন কণার সমষ্টি তখন ৫০ থেকে ৬০ লক্ষের মত ১ লিটারে। এইসব কণার উপরে ভর ক'রে তুলনামূলক অল্প আর্দ্রতাতেই মেঘ তৈরি হয়।

কিন্তু এই মেঘ বেড়ে যায় কেমন ক'রে? বাষ্পীভবন যখন চলতে থাকে, তখন জলকণাগুলির উপরে ক্রমে ক্রমে আরও জল জমা শুরু হয়। প্রথমে এর হার খুব বেশি থাকে, পরে তা কমে আসে। খিদের মুখে প্রথম বেশি খাওয়ার মত অবস্থা অনেকটা।

তবে জলকণাগুলির ব্যাসার্ধ বাড়তে আরম্ভ করলেই যে বৃষ্টি হবে, তা নয়। জলকণাগুলির ব্যাসার্ধ অনেক বেড়ে গেলে তবেই তা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসবে। তা না হলে ওই সব ক্ষুদ্র জলকণাগুলি আবার মেঘ থেকেই বাষ্প হবে, না হলে নীচে নেমে আসতে আসতেই বাষ্প হয়ে যাবে। একটা যদি ·১ মিলিমিটার ব্যাসার্ধের জলকণাকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে মাত্র ১৫০ মিটার নিচে নামতে না নামতেই তা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, সব মেঘই যে জলকণা দিয়ে তৈরি তা নয়। ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে যত উপর দিকে ওঠা যায় তাপমাত্রা ততই কমে আসতে থাকে। এইভাবে উঠতে উঠতে আমরা হিমাঙ্কে পৌঁছে যাবো। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এই হিমাঙ্কস্তর পাওয়া যায় ৪৫০০ থেকে ৫০০০ মিটার উচ্চতায়। শীতকালে তা অবশ্য কিছুটা নেমে আসে। তখন হিমাঙ্ক-স্তর থাকে ৩৬০০ থেকে ৪০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে। নিম্ন-মেঘ সাধারণভাবে হিমাঙ্ক-স্তরের উপরে ওঠে না। সেইজন্যে তা জলকণা দিয়েই তৈরি। কিন্তু যখন কোনো মেঘ হিমাঙ্ক-স্তরে মাথা তোলে তখন কি হয়?

মনে হয়, যে সব জলকণায় মেঘ তৈরি, বোধ হয় তারা জমে বরফ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঘটে না। মেঘের জলকণাগুলি থাকে হিমাঙ্কের চেয়ে ঠাণ্ডা অথচ জলীয় অবস্থায়।

আসলে এরা হল অতি শীতল জলকণা। সামান্য আঘাতেই আণবিক আকারের প্রকার ভেদ ঘটিয়ে এরা হিমকণায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাহলে নিম্ন মেঘ শুধু জলকণায় তৈরি হলে কি হবে, মধ্য-মেঘে জলকণার সঙ্গে থাকে কিছু অতি শীতল জলকণা। কিন্তু উচ্চ-মেঘ তৈরি হয় হিমকণা দিয়েই।

এইভাবে জলবিন্দু সৃষ্টি হয়ে উর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহে পড়ে হিমাঙ্ক-স্তরের উপরে উঠলে কিছু জলবিন্দু অতিশীতল হয়ে যায় আবার কিছু বরফের কুচিতে পরিণত হয়। এখানে যে সব অতিশীতল জলবিন্দু আছে তাদের ব্যাস বরফের কুচির ব্যাসের চেয়ে অনেক কম। এই অতিশীতল জলকণাগুলির কণার আকার বজায় থাকতে হলে তাদের উপরে জলীয় বাষ্পের যে চাপ দরকার অর্থাৎ যতটা জলীয় বাষ্পের জোগান থাকা উচিত, ততটা পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কিছুক্ষণ বাদে এই অতি শীতল জলকণাগুলি আবার বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কিন্তু বাষ্পীভবনের পরেই ওই অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাসের হিমকণা বর্তমান থাকার জন্যে ওই জলীয় বাষ্প আবার দ্রবীভূত হয়ে ওই বরফের কুচির উপরে ভর ক'রে অনেক বড় জলকণা তৈরি করে—যার কেন্দ্রে আছে একটা অপেক্ষাকৃত বড় বরফের কুচি। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ওই অঞ্চলটিতে শুধু বরফের কণার উপরে ভর করা জলবিন্দুই বর্তমান থাকে। বিশাল হিমকণার সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়। যদি ৫০ লক্ষের মত দ্রবীভবন কণা থাকে ১ লিটার বাতাসে, তাহলে বিশাল হিমকণার সংখ্যা সেখানে হবে মাত্র ১০ থেকে ১০০টা।

এই সব বড় আকারের হিমকণাগুলি যখন নিজেদের ভারে নিজেরা নামতে থাকে, তখন চারপাশের ছোট ছোট জলকণাগুলি এদের গায়ে লেগে বড় বড় ফোঁটা তৈরি করে। আর এইভাবে জলবিন্দুর ব্যাস যখন ১ মিলিমিটার বা তার চেয়ে বেশি হয়, তখনই এরা বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে।

তাহলে বৃষ্টি হওয়ার জন্যে মেঘের উচ্চতা হিমাঙ্ক-স্তরের উপরে

যাওয়া চাই। না হলে অতি শীতল জলকণা বা হিমকণা তৈরি হবে না।

কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান বিভিন্ন দেশে, বিশেষ ক'রে মৌসুমী অঞ্চলে যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, তার সবগুলিই যে হিমাঙ্ক-স্তরের উপরে থাকে, তা নয়। বরং অনেক মেঘই হিমাঙ্ক-স্তরের নীচে লক্ষ্য করা যায়। এ মেঘে তাহলে বৃষ্টি দেয় কেমন ক'রে?

আসলে মৌসুমী অঞ্চলে বাতাসে থাকে প্রচুর জলীয় বাষ্প। সেই জলীয় বাষ্প বিভিন্ন ভাসমান কণাকে অবলম্বন ক'রে সহজেই জলকণা তৈরি করতে পারে। এদিকে জলীয় বাষ্পের কোনো ঘাটতি নেই। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বড় বড় ফোঁটায় সহজেই পরিণত হয়। আর এই বড় ফোঁটাগুলি যখন ছোট ছোট ফোঁটার ভিতর দিয়ে নামতে থাকে, তখন ছোট ফোঁটাগুলি বড় ফোঁটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বড় ফোঁটা তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত জলের ফোঁটার ব্যাস যখন ১ মিলিমিটার বা তার চেয়ে বেশি হয়, তখনই বৃষ্টির আকারে তা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে।

কিন্তু যে জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ হয়, বাষ্পীভবনের পর সেই বাষ্প মেঘ হওয়ার মত উপরে উঠে যাচ্ছে কেমন ক'রে? আসলে বাষ্পীভবনের পরে বায়ুস্রোত ঊর্ধ্বমুখী থাকলেই মেঘ তৈরি হবে ও বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেবে। আর এই বায়ুস্রোত খুব বেশি হলেই সেই মেঘে বৃষ্টি নামবে।

কিন্তু এই ঊর্ধ্বমুখী বায়ুস্রোত আসে কোথা থেকে? আর কি ভাবেই বা তা বেড়ে ওঠে?

নিম্নচাপ ক্ষেত্রে বাতাসের চাপ কম। সেদিকে বায়ু প্রবাহিত হবে আশেপাশের অঞ্চল থেকে। কিন্তু সে বাতাস সরাসরি এগোয় না। তা এগোয় ঘুরতে ঘুরতে। উত্তর গোলার্ধে এ একভাবে ঘোরে, দক্ষিণ গোলার্ধে আর একভাবে। উত্তর গোলার্ধে যখন বায়ুপ্রবাহ এগোয়, তখন সেটা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ ক্ষেত্রে চলে আসে। দক্ষিণ গোলার্ধে ব্যাপারটা ঠিক

এর উল্টো। সেখানে বায়ুপ্রবাহ নিম্নচাপের দিকে এগোবে ঘড়ির কাঁটার দিক ধরে। হাওয়া যখন চক্রাকারে ঘোরে, তখন উপর দিকে তার একটা গতির সঞ্চার হয়। ফলে নিম্নচাপ ক্ষেত্রে ঢুকবার সময়ে বায়ুস্রোত উর্ধ্বগামী হতে থাকে। আর তখন আকাশে মেঘ জমতে দেখা যায়। যখন গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, তখন উর্ধ্বগামী বায়ুস্রোতের গতি আরও বাড়ে। সেইজন্যে আকাশে ভাল রকম মেঘ জমার কথা আর বৃষ্টি নামারও সম্ভাবনা।

নিম্নচাপ ক্ষেত্রে বায়ুর চাপ কি রকম? নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, চাপের সঙ্গে নিম্ন কথাটা যুক্ত আছে বলে, আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ে সেই অঞ্চলের বায়ুর চাপ কিছুটা কম হবে। দৈর্ঘ্য মাপার যেমন একক আছে, তেমনি ক্ষেত্র বা ওজন পরিমাপেরও একক আছে। বায়ুর চাপেরও হিসেব করা হয় একটা একক ধরে। সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার দূরত্বের একক, ক্ষেত্রের বেলায় বর্গ সেন্টিমিটার, বর্গ মিটার বা বর্গ কিলোমিটার বলি, ওজনের হিসেবে গ্রাম কথাটা আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। আর বায়ুর চাপের বেলায় আমরা কাজে লাগাই ডাইন এককটিকে আর প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে তার পরিমাপ করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠে সমদ্রতলে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এই চাপ সাধারণ অবস্থায় থাকে $১\cdot০১৩২০০ \times ১০^{৬}$ ডাইন। $১০^{৬}$ মস্ত বড় একটা সংখ্যা। একে যদি নতুন একটা নাম দিয়ে বলা হয় ১ বার (Bar), তাহলে সাধারণ অবস্থায় বায়ুর চাপের হিসাব দাঁড়ায় ১.০১৩২০০ বার। ১ মিটারের হাজার ভাগের ১ ভাগ যেমন ১ মিলিমিটার, তেমনি ১ বারের হাজার ভাগের ১ ভাগ ১ মিলিবার (Milibar)। সাধারণ অবস্থায় বায়ুর চাপের উল্লেখ করা হয় এই মিলিবারে।

নিম্নচাপ ক্ষেত্র যখন তৈরি হয়, তখন সেই অঞ্চলের বায়ুর চাপ আশেপাশের অঞ্চলের বায়ুর চাপের থেকে ২—৪ মিলিবারের মত কম থাকে। যদি বায়ুর চাপ আরও কম হয় এবং ৪ থেকে ৬ মিলিবারের মত তফাৎ ঘটায়, তখন সেই নিম্নচাপ আরও একটু

গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই ধরনের নিম্নচাপকে বলে ডিপ্রেসান (Depression)। ডিপ্রেসান আরও গভীর হতে পারে। তখন হয়তো আশেপাশের অঞ্চলের চেয়ে নিম্নচাপ অঞ্চলের বায়ুর চাপ ৬ থেকে ৮ মিলিবারের মত কম হবে। আরও গভীর হলে ৮ মিলিবারকেও ছাড়িয়ে যাবে। তখন যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়, তাকে বলে সাইক্লোন ঝড় (Cyclone storm)। সে ঝড়ের দাপট বলবার কথা নয়। আমরা অনেক সময়ে বলি, গাড়ি ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে। সে ঝড় যদি এই সাইক্লোন ঝড় হয়, তাহলে তার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার হবে কমপক্ষে। তার চেয়ে অনেক বেশি হওয়াও সম্ভব।

সাইক্লোন ঝড়ের সঙ্গে আমাদের অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে, আরব সাগরের চেয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রতি বছর সাইক্লোন ঝড় সৃষ্টি হয় অনেক বেশি। কেন যে এ রকম হয়, আবহ-বিজ্ঞানীরা তারও একটা কারণ খুঁজে বের করেছেন। পরিমাপ করে দেখা হয়েছে যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি ২৭ ডিগরি সেলসিয়াস বা তার বেশি হয়, তাহলে সাইক্লোন ঝড় সৃষ্টি হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরব সাগরের চেয়ে বেশি। সেইজন্যে আরব সাগরের চেয়ে বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোন ঝড়ের বেশি আশঙ্কা। বদ্ধ জলায় মশা যেমন ডিম পাড়ে, তেমনি উষ্ণ সাগরেই সাইক্লোন ঝড়ের বেশি সৃষ্টি।

তা ছাড়া আরও একটা বলার মত কথা আছে। বর্ষাকালেই স্বাভাবিকভাবে আমাদের এদিকে ঝড়-জলের তাণ্ডবটা বেশি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগে এসে পৌঁচোচ্ছে। নিরক্ষরেখার উত্তর অঞ্চলের মানুষ আমরা। উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ অঞ্চলের চারপাশে বায়ুর গতি থাকে ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-প্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথের সঙ্গে এটা মিলে যায়। দক্ষিণ-

পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগে এসে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে আসে। এই রকম ঘড়ির কাঁটার উল্টোমুখে ঘোরার ফলে বঙ্গোপসাগরে সহজেই নিম্নচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আরব সাগরে সে সুযোগ নেই।

সাইক্লোন আমাদের সকলের কাছেই বিভীষিকার মতন। 'সাইক্লোন' নাম শুনলেই মনে হয়, কাছে-পিঠেই যেন আমাদের দুর্যোগ। দুর্যোগ ঘটানোর প্রতিমূর্তি কথাটা এসেছে একটা গ্রিক শব্দ থেকে, অর্থ সাপের কুণ্ডলী। সাপকে কে না ভয় পায়? উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলকাতা শহরেই শব্দটা প্রথম ব্যবহৃত হয়। ব্যবহার করেন হেনরি পিডিংটন। বঙ্গোপসাগরে এবং আরব সাগরে অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় বোঝাতেই এই শব্দটি উল্লেখ করা হত। নিরক্ষীয় অঞ্চলের যে কোনো ঝড়ের বেলায় সাইক্লোন শব্দটি চললেও, বিভিন্ন দেশে সাইক্লোন বোঝানের জন্যে আরও কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার আছে। হারিকেন কথাটা আমরা জানি, এটা চলে অতলান্তিক মহাসাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। টাইফুন কথাটা চলে আসছে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। আর একটা নাম আছে, সেটি 'উইলি-উইলি'। অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে এই নামটার প্রচলন আর ফিলিপাইন অঞ্চলে যেটার চল, সেটি হল 'বাগুইও'। কিন্তু যে নামে ডাকা হোক না কেন, সবই হল সাইক্লোন।

সাইক্লোন এতই মারাত্মক যে, তার পূর্বাভাস না পেলে আমাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। নিরক্ষীয় অঞ্চলের একটি ঘূর্ণিঝড় —যখন সে পূর্ণতা পায় তখন তার চেহারা মারাত্মক। উচ্চতায় ১০ থেকে ১৭ কিলোমিটার এবং এই ঘূর্ণিঝড় চওড়ায় ১৫০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ের একটা কেন্দ্র বা চোখ আছে এবং সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে দৈনিক এ ৩০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটারের মত এগিয়ে আসে। পরিণত মানুষের

মত পরিণত ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের ৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ বাতাস বয় খুব জোরে আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি তো আছেই। সমুদ্রও উত্তাল—ঝড়ের পূর্বাভাস ঠিকমতো পাওয়া গেলে যাঁরা নৌকোয় পাল তুলে বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরার জন্যে, তাঁদের সবাইকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়।

একটা সাইক্লোন ঝড়ের মোটামুটি চারটে অংশ থাকে।

১. কেন্দ্রীয় শান্ত বা স্থির অঞ্চল, এর ব্যাস ১০ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে হতে পারে। এখানে বাতাস শান্ত বা বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত ধীর, আকাশ নির্মেঘ বা সামান্য মেঘলা ভাব থাকতে পারে। এই অঞ্চলটিকে সাইক্লোনের চোখ বলা হয়।

২. এরপর এই সাইক্লোনের চোখকে ঘিরে একটা বলয়াকার অঞ্চল আছে। অঞ্চলটার বিস্তৃতি ৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটার। বাতাসের গতি এখানে ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটারের মত। কিন্তু এই গতিবেগ ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি হওয়া সম্ভব। এই অঞ্চলের মধ্যে বাতাসের চাপ কমে এসেছে অতি দ্রুত এবং এখানে বৃষ্টিপাত প্রবল। এই অঞ্চলটাকে বলা যায় চোখের প্রাচীর।

৩. চোখের প্রাচীরের বাইরেও ঝড়ের একটা ক্ষেত্র থেকে যায়। সেখানে চোখের কেন্দ্র থেকে যত বাইরের দিকে যাওয়া যাবে ততই ঝোড়ো বাতাস কমে আসবে। কিন্তু ঝড়ের দাপট সেখানেও উপেক্ষা করা চলবে না।

৪. আর একেবারে বাইরে সাইক্লোন ঝড়ের দুর্বলতম অবস্থা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে সাইক্লোন ঝড় কম বয়ে যায়নি। তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর। এ পর্যন্ত ইতিহাসে যত সাইক্লেনের খবর লিপিবদ্ধ করা আছে, তার ভিতর ১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবরের সাইক্লোনের স্মৃতি ভয়াবহ। বাতাসের গতিবেগ ছিল ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি। ঝড়ের আসল ধাক্কাটা অবশ্য

কলকাতার উপর দিয়ে যায়নি। তবু কলকাতার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার জোর খুব কম ছিল না। তখন সবচেয়ে বেশি গতিবেগ উঠেছিল ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটারের মত। ওই সাইক্লোনে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জোরালো বৃষ্টি হয়। সে বৃষ্টির পরিমাণ এত বেশি যে, ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে ৩০ সেন্টি-মিটারের মত বৃষ্টি পড়ে। ঝড়ের সঙ্গে সেই সময়ে সমুদ্রও ছিল অত্যন্ত উত্তাল। বড় বড় ঢেউ এগিয়ে আসতে থাকে স্থলভাগের উপরে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। ৬০০ বর্গ কিলোমিটারের বেশি জায়গা জলে ডুবে যায়। কোথাও কোথাও ৫ মিটারের বেশি জল দাঁড়ায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয় মেদিনীপুরে আর ২৪ পরগণায়। প্রায় ১৫০০০ লোকের জীবনহানি ঘটে আর গবাদি-পশু মারা যায় প্রায় ৬০০০০।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে যে সাইক্লোন হয়, তার প্রকোপও কম ছিল না। তাতেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলপ্লাবিত হয় এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও ছিল প্রভূত।

তবে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বাংলাদেশে সাইক্লোনের প্রকোপ বেশি। ১৯৭০-এর নভেম্বর মাসে এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বাংলা-দেশের তটভূমিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সম্প্রতি ১৯৯১-এর প্রথম দিকের সাইক্লোনও বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত করে।

যে দুর্যোগে প্রাণ সংশয় এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা, তার পূর্বাভাস পেলে আগে থেকে সতর্ক হওয়ার একটা সুযোগ থাকে। ২৪টা ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট। নিজেদের গুছিয়ে নেওয়া যায় ওই সময়ে। সমুদ্রের তটদেশে যাদের আস্তানা, তারা ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। উঁচু জায়গা তখন সকলের লক্ষ্য।

ঝড়ের এত শক্তি আসে কোথা থেকে?

বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ছে, বাড়ি-ঘরের চাল উড়ে যাচ্ছে,

মাটির বাড়ি ভেঙ্গেচুরে তছনছ, জলপথে নৌকাডুবি—ঝড়ের এত শক্তির উৎস কি ?

ঝড়ের সময়ে আকাশে যে মেঘ দেখা যায়, আকারে তা বিরাট। এই মেঘের জন্যে অনেক জলীয় বাষ্প দ্রবীভূত করা দরকার। প্রতি গ্রাম জলীয় বাষ্প জমে জল হওয়ার সময়ে অবস্থার রূপান্তর ঘটে। বাষ্প হয়ে যাচ্ছে জল অর্থাৎ রূপান্তর ঘটছে তরলে। প্রতি গ্রাম জলীয় বাষ্প তরল হলে ৫৪০ ক্যালরি তাপ বেরিয়ে আসে। ক্যালরি তাপের একক।

তাহলে এক গ্রাম ভরের জলীয় বাষ্প একই তাপমাত্রা বজায় রেখে শুধু যদি বাষ্প থেকে জলে রূপান্তরিত হয়, তাহলে অবস্থার এই রূপান্তরের জন্যে তাপ বেরোবে ৫৪০ ক্যালরি। এই যে তাপ, যা তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবলমাত্র অবস্থার রূপান্তরের জন্যে বেরিয়ে আসে, একে বলে লীন তাপ। লীন কথাটার অর্থ হল লুকোনো। এ নামকরণ সার্থক। বাইরে না দেখা গেলেও অবস্থার পরিবর্তনের সময়ে লুকোনো এ তাপ বেরিয়ে আসছে। ইংরেজি কথাটা হল Latent heat। এখন তাপ কতটা বেরিয়ে আসবে, মেঘের আকারের উপরে তার পরিমাণ নির্ভর করে। ছোট আকারের মেঘ হলে তাপ বেরোবে অল্প, বড় আকারের মেঘে বেশি তাপ বেরিয়ে আসবে। শক্তির রূপান্তর ঘটে, আমরা জানি। এক শক্তি রূপান্তরিত হয় আর এক শক্তিতে। এখানে তাপশক্তি রূপান্তরিত হয়ে যায় ঝড়ের হাওয়ার গতি-শক্তিতে। ঝড়ের বড় মেঘের বেলায় যে তাপশক্তি রূপান্তরিত হয় গতিশক্তিতে, তার পরিমাণ কম নয়।

আমাদের দেশে বড় বড় সাইক্লোন ঝড় সাধারণভাবে দেখা যায় বর্ষা নামার আগে আর বর্ষা চলে যাওয়ার পরে অর্থাৎ একবার এপ্রিল-মে মাসে আর একবার সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। বর্ষার আগে-পরের এই সাইক্লোন ঝড়গুলি মারাত্মক ধরনের। আবহ-বিজ্ঞানীরা এদের উৎপত্তি স্থলের অঞ্চলটা নির্দেশ ক'রে

বলেছেন, এই দুই সময়কালের সাইক্লোন ঝড়ের সৃষ্টি ১০ ডিগরি থেকে ১৪ ডিগরি উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে। কিন্তু ডিসেম্বরে ঝড় সৃষ্টি হয় আরও নীচু অক্ষাংশে। তা ৪ ডিগরি উত্তর অক্ষাংশে পর্যন্ত হওয়া সম্ভব। প্রথম অবস্থায় এদের গতি উত্তর-পশ্চিম দিকে, তারপর এরা কিছুটা ঘুরে যায় উত্তর বা উত্তর-পূর্বে। এই ঝড়ের সঙ্গে যে জোরালো বাতাস বয়, সচরাচর তা থাকে ঝড়ের উত্তর দিকে।

সমুদ্রের উপরে এই ঝড়ের পথ কতটা দীর্ঘ?

সুনিশ্চিতভাবে তা বলা কঠিন। তবে বর্ষার আগে পরে যে সব সাইক্লোন ঝড় দেখা দেয়, তাদের পথের দৈর্ঘ্য ৮০০ কিলোমিটারের বেশি হওয়া সম্ভব। সমুদ্রের বুকে সৃষ্টি হওয়ার পরে গড়ে এ প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার পথ এগিয়ে চলে এবং সাধারণভাবে ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার পথ পার হওয়াই এর পক্ষে যথেষ্ট। তবে এক একটা সাইক্লোনের পথ চলার হিসেবটা এক এক রকমের। আবার একই সাইক্লোনের জীবনের বিভিন্ন সময়ে গতিবেগ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো কোনো সাইক্লোন দেখা গেছে, প্রথম ৩/৪ দিন একেবারে স্থির। আবার কেউ বা একদিনেই এগিয়ে গেছে ১০০০ কিলোমিটারের মত পথ। তবু একটা কথা সাধারণভাবে বলা যায়, গোড়ায় এর গতিবেগ অত্যন্ত শ্লথ, ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটারের চেয়েও কম। সাইক্লোনের গতিবেগ যেমনই হোক না কেন, সাইক্লোন মোটামুটিভাবে চলে একটা সোজা বা বক্রাকার পথে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে, সাইক্লোন চলেছে একেবারে আঁকাবাঁকা বেহিসেবি পথে আর সে রকম দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়।

আমাদের দেশে যত সাইক্লোন ঝড়ের সৃষ্টি, তার মধ্যে পাঁচটা সাইক্লোন বঙ্গোপসাগরে হলে আরব সাগরে সৃষ্টি হয় মাত্র একটা। একটা হিসেবে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগরে যত সাইক্লোন ঝড়ের সৃষ্টি তার চারভাগের একভাগ আর আরব সাগরের সমস্ত সাইক্লোনের প্রায় অর্ধেক গুরুতর ধরনের। প্রতি বছর প্রাক্‌মৌসুমী কালে একটা মারাত্মক সাইক্লোন দেখা দিতে পারে বঙ্গোপসাগরে আর বর্ষার শেষে একটা বা দুটো। ফলে প্রতি বছর বঙ্গোপসাগরে মারাত্মক রকমের তিনটি সাইক্লোন ঝড়ের উৎপত্তি আশ্চর্য নয়।

মৌসুমী বায়ু

মৌসুমী বায়ু কথাটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটা পরিচয় আছে। অবশ্য বাংলায় মৌসুমী বায়ুর বদলে ইংরেজি Monsoon কথাটাই বেশি চালু—বর্ষা নামার মুখে আমরা প্রায়ই বলি Monsoon এল বলে। মূল শব্দটা হল Mausim, অর্থ ঋতু, অর্থাৎ এই বায়ু ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বছরে ছু'বার দিক পরিবর্তন করে। আরব সাগরের উপর দিয়ে বছরে ছু'বার দিক বদল ক'রে যে বাতাস বয়, মৌসুমী কথাটা সেই বাতাসের ক্ষেত্রেই প্রথম প্রয়োগ করা হয়। কয়েক মাস বাতাস বয় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। তারপর দিক বদল করে দক্ষিণ-পশ্চিমের বদলে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বইতে শুরু করে। এইভাবে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়।

বায়ুপ্রবাহের এই ধরনের দিক পরিবর্তন যেখানে যেখানে হয়, সেই অঞ্চলগুলিকে মৌসুমী অঞ্চল বলে। তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, চীনদেশের দক্ষিণাংশ, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া, আরবদেশের দক্ষিণাংশ, পূর্ব আফ্রিকা, সিয়েরা সিওঁ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আমাদের ভারতবর্ষও মৌসুম-প্রধান অঞ্চল। এই সব দেশে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়ে থাকে।

মৌসুমী বায়ু কথাটির যেমন একটা বৈজ্ঞানিক দিক আছে, তেমনি তার লোকপ্রিয় অর্থও একটা নজরে আসবে। আবহ-বিজ্ঞানীরা এটিকে দেখেন, একটি ঋতু-নির্ভর বায়ু প্রণালী হিসেবে এবং সেইজন্যে মৌসুমী বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম, না হলে, উত্তর-পূর্ব হিসেবে আখ্যা দেন। মৌসুমী বায়ু নিয়ে কাজকর্মের ক্ষেত্রে বায়ুপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যের দিকেই তাঁদের নজর থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্যান্য পরিমণ্ডলের মানুষের কাছে বিষয়টা চলে যায় সরাসরি অন্যদিকে। সেখানে মৌসুমী বায়ুর পূর্বাভাস মানেই বর্ষা নামার সম্ভাবনা। এই মৌসুমী বায়ু অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম

মৌসুমী বায়ু। এর সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে চাষবাস আর চাষবাস মানেই ভাতরুটি এবং সেই সঙ্গে আমাদের অর্থনীতির সম্পর্ক। ফলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে মৌসুমী বায়ুর আসার সময়কালটা জানা বিশেষ দরকার।

আমাদের কলকাতায় বর্ষা নামার সময়কাল ৮ জুনের কাছাকাছি অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সময় সূচনা হচ্ছে ওই সময় থেকে। আমাদের দেশে এই মৌসুমী বায়ুর প্রভাব থাকে দুই থেকে চার মাস, অঞ্চল ভেদে কোথাও দু'মাস, কোথাও আবার চার মাস। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। বর্ষা আসায় তার শুরু আর বর্ষা চলে যাওয়ার ভেতর দিয়ে তার শেষ। ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। আগে সে তামিলনাড়ুতে আসবে, তারপর উড়িষ্যার উপকূল পার হয়ে সে এসে পৌঁছবে পশ্চিম-বাংলায়। অবশেষে তা আমাদের দেশের উত্তর সীমানা পার হয়ে যাবে। দক্ষিণে তার প্রবেশ আর উত্তরে তার প্রস্থান বলে উত্তরে এর স্থিতি তুলনায় অল্প সময়ের জন্যে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নেওয়ার পরে একমাস বলা চলে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের বিরতি। মোটামুটি ভাবে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করে নভেম্বর মাস থেকে এবং জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তার সময়কাল।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর সৃষ্টি সাইবেরিয়াতে—বৈকাল হ্রদের কাছে। সেখানে শীতকালে বায়ুমণ্ডলে একটি বিরাট উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে ওখানে যে বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তা যখন উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হিমালয় পার হয়ে আসাম ও পশ্চিমবাংলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সে বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত শুষ্ক। কারণ এই বায়ুপ্রবাহ পুরোপুরি স্থলভাগ অতিক্রম ক'রে আসছে। সেইজন্যে শীতকালে আমাদের গা ফাটে এবং ঠোঁট শুকনো হয়ে যায়। কিন্তু যখন তা পশ্চিমবাংলার সীমানা হয়ে আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে

চলে, তখন সে সামনে পায় বঙ্গোপসাগর। ফলে শুকনো বাতাস জলীয় বাষ্পে ভরপুর হয়ে ওঠে। সেইজন্যে বঙ্গোপসাগর পার হয়ে যখন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু তামিলনাড়ু বা দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলভাগে প্রবেশ করে তখন এর ভাঁড়ারে জমা হয় অনেক জলীয় বাষ্প। আর তার প্রভাবে তামিলনাড়ু সমেত দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টিপাত ঘটে।

সরল ব্যাখ্যায় বলা যায়, মৌসুমী বায়ু জলবায়ু এবং স্থলবায়ু বিশেষ। এই বায়ু যে কেবল তটরেখা বরাবর এক ফালি জায়গা জুড়ে আছে, তা নয়, সমুদ্র এবং স্থলভাগের হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে এর বিস্তৃতি। আলো-অন্ধকারকে আমরা দেখি, তারা আসে যায় দিন-রাতের সঙ্গে তাল রেখে। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর বেলায় দিন রাত ধরে পালা-বদল চলে না। সেখানে দিক-বদল ঘটে ঋতুচক্রের শীত আর গ্রীষ্ম ঋতু ভর ক'রে। স্থলভাগ গ্রীষ্মে উত্তপ্ত হয় এবং শীতে শীতল থাকে। কিন্তু সন্নিহিত অঞ্চলের সাগরের তাপমাত্রা তুলনায় অপরিবর্তিত রয়ে যায়। ফলে গ্রীষ্মের দিনগুলিতে ভূ-ভাগ সন্নিহিত বাতাস উত্তপ্ত এবং হালকা হয়ে যখন উপরে উঠে যেতে থাকে তখন সেই শূন্যস্থান ভরে নেওয়ার জন্যে জলীয় বাষ্প ভরা সাগরের বাতাস ছুটে আসে। আর শীতকালে অবস্থাটা বিপরীত রকমের। তখন সাগরের চেয়ে স্থলভাগ শীতল। সে সময়ে স্থলভাগের উপরের বাতাস ছুটে যায় সাগরের দিকে।

মৌসুমী বায়ুর মত বায়ুপ্রবাহ আছে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশেই। কিন্তু মৌসুমী বায়ুর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এশিয়া মহাদেশ। একটি হিমালয়ের উত্তর ভাগে, অন্যটি দক্ষিণে। উত্তর ভাগেরটি জাপান এবং চীনদেশের দক্ষিণে প্রবহমান—এটি পূর্ব এশিয়া মৌসুমী। অন্যটি দক্ষিণ এশিয়া মৌসুমী বায়ু—হিমালয়ের দক্ষিণে আমাদের দেশ জুড়ে যার অস্তিত্ব।

মৌসুমী বায়ুর আসার বা যাওয়ার সময়ের দিন-ক্ষণ যে একেবারে নির্ধারিত রয়েছে, এমন নয়। বছরের পর বছর

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কখনো সে এগিয়ে আসছে, আবার কখনো তা পিছিয়ে যাচ্ছে। হতে পারে, তার আসার স্বাভাবিক তারিখটার চেয়ে সে এক পক্ষকাল এগিয়ে এল বা পিছিয়ে গেল ওই রকম সময়ের জন্যে। চলে যাওয়ার বেলাতেও এমন হওয়া সম্ভব।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উৎপন্ন হয় দক্ষিণ গোলার্ধে। মালাগাসির পূর্বে (পূর্বতন ম্যাডাগাসকার), ভারত মহাসাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে শীতকাল। ওই অঞ্চলে সে সময়ে একটি উচ্চচাপ-ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই উচ্চচাপ-ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল ম্যাকাসার দ্বীপপুঞ্জের কাছে। কোনো কেন্দ্র থেকে চারদিকে যেমন খবর ছড়ায়। তেমনি ম্যাকাসার দ্বীপপুঞ্জ থেকে বায়ুপ্রবাহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই ছড়িয়ে পড়া বায়ুপ্রবাহের একটা অংশ উত্তর-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে বিষুবরেখা অতিক্রম করে। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যে মোড় ঘুরে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। তাহলে আমাদের দেশে এই বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এসে প্রথমে পশ্চিম তটভাগ অতিক্রম করে। সেইজন্যে এই বায়ুপ্রবাহের নাম দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু।

আমাদের দেশে যখন গ্রীষ্মকাল পাকিস্তানে এবং আফগানিস্তানে তখন প্রচণ্ড তাপের ফলে একটা নিম্নচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ ঘুরে গিয়ে এই নিম্নচাপের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসা বায়ুপ্রবাহ কোন অঞ্চলে এসে ঘোরে এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পাকিস্তানের নিম্নচাপ অভিমুখে ধাবিত হয়? এই শেষ ঘোরার ব্যাপারটা ঘটে বঙ্গোপসাগরের উত্তর অংশে সাধারণত ১৭ থেকে ২৩ ডিগরি অক্ষাংশ বরাবর। আবহ-বিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলটিকে মৌসুমী ঢাল বা মনসুন ট্রাফ (Monsoon trough) নামে অভিহিত করেছেন।

বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে মৌসুমী ঢালের একটা ভূমিকা আছে। ফলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্যে মৌসুমী ঢাল সম্পর্কে কিছুটা অবহিত থাকা দরকার।

মৌসুমী ঢালের একটা বৈশিষ্ট্য, ওই অঞ্চলে বাতাসের একটা আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে। বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এসে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘোরার জন্যেই এই আবর্তের সৃষ্টি। আবর্ত মানে পাক খাওয়ার মতন একটা ব্যাপার। বাতাসের কোনো আবর্তের মধ্যে পড়ে শুকনো পাতা যেমন পাক খেতে খেতে উপরে উঠে যেতে থাকে ঘুরতে ঘুরতে, ঠিক সেই রকম এই মৌসুমী বায়ুও উপরে উঠে যায়। মৌসুমী বায়ু সাগর-মহাসাগরের উপর দিয়ে আসে বলে তা প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। সেই-জন্যে এই বায়ুপ্রবাহে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশি। ফলে যখন তা ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন আকাশে প্রচুর মেঘ জমে এবং বৃষ্টিপাত ঘটে। এই কারণে মৌসুমী ঢালের আশপাশের অঞ্চলের বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। এবং মৌসুমী ঢালের যে অংশ বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে, সেই অঞ্চলেই সাধারণত নিম্নচাপ ক্ষেত্র, সাইক্লোন ঝড় সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, মৌসুমী ঢালের একটা অক্ষরেখাও আছে। এই অক্ষরেখার উচ্চতা ৬ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এর ঝোঁকটা থাকে দক্ষিণের দিকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাল অক্ষের দু' দিকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটাই মাঝারি ধরনের বৃষ্টি পায়।

কিন্তু মৌসুমী ঢালের অবস্থানকে কখনোই সুনির্দিষ্ট বা স্থির বলা যাবে না। দক্ষিণ বা উত্তর বরাবর এর অবস্থান সরে সরে যায় অর্থাৎ অক্ষাংশ বরাবর এর ওঠা-নামা চলে। যখন ঢালটি উত্তর দিকে উঠতে উঠতে হিমালয়ের পাদদেশে এসে পড়ে তখন হিমালয়ের পাদদেশ সমেত বিহারের সমতলভূমি, উত্তরবঙ্গ, উত্তর আসাম এবং অরুণাচলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। কিন্তু মজার কথা, এই সময়টাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। মনে হয়, অন্যত্র যেন বৃষ্টিপাতের এক সাময়িক বিরতি বা ছেদ। এই অবস্থাটাকে তাই মৌসুমী ছেদ (Break in monsoon) বলে। তাহলে মৌসুমী ঢাল কোথায় আছে জানা থাকলে কোন অঞ্চলে সে সময়ে কি রকম বৃষ্টিপাত হবে, তার একটা আন্দাজ করা সম্ভব।

পূর্বাভাস ঃ অতীত এবং ভবিষ্যৎ

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লিউইস ফ্রাই রিচার্ডসন (Lewis Fry Richardson) নামে একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ্ সংখ্যাভিত্তিক পদ্ধতিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার এক পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে না বললে চলে না। আবহ-মণ্ডলের পরিবর্তন গতিবিদ্যা এবং তাপ গতিবিদ্যার সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর আবহমণ্ডলের কোনো সময়ের অবস্থা যদি জানা যায়, তাহলে ওই সূত্রের প্রয়োগে ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের অবস্থাও তো জানা সম্ভব। আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এই সব সূত্র প্রয়োগ যে খুব সহজ, এমন মোটেই নয়। তবে সময় কম হলে সূত্রটিকে সরল ক'রে প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। এবং এইভাবে বারংবার যদি গণনার কাজ চলে, তাহলে প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ের জন্যেও পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

ব্যাপারটার সূচনা বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়। প্রথম উদ্যোগ নিলেন প্রোফেসর ভি জের্কনেস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। ইনি ছিলেন একজন নরওয়ের আবহবিদ। কিন্তু সমস্ত তথ্য নিয়ে অগ্রসর হওয়া এমনই দুরূহ এবং জটিল যে কাজ বেশিদূর এগোয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এলেন রিচার্ডসন। রিচার্ডসনের জন্ম ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ১৯২২-এ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের উপরে একটি বই লেখেন, 'Weather Prediction by Numerical Process'। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জের্কনেসের সমস্যার আরও উন্নত গাণিতিক সমাধান দেবার চেষ্টা করলেন রিচার্ডসন এই বইয়ের মধ্যে। কিন্তু তিনি বললেন, আগামী দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যে ৬৪০০০ মানুষকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার

হিসেবে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে যে মানুষটি একটি মূল্যবান বই লিখলেন এবং বিশ্বযুদ্ধের শেষে তা প্রকাশ করলেন, আগামী ২৫ বছরে তা কোনো বাস্তব চেহারা পেল না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্রুতগতি কমপিউটার আবিষ্কারের ফলে কঠিন গাণিতিক সমাধান অত্যন্ত সহজে এবং অল্প সময়ে বের করা সম্ভব হল। তখন রিচার্ডসনের তথ্যগুলি আবার প্রয়োগ করা হতে লাগলো। অবশ্য মূল পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। কিন্তু আধুনিক দ্রুতগতি কমপিউটারের প্রয়োগে পূর্বাভাস মিলেছে চমকপ্রদভাবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার এই পদ্ধতিকে বলা হয় Numerical Weather Prediction (NWP)। আজকাল আবহাওয়ার অনেক মডেল তৈরি ক'রে তার সাহায্যে অনেক নতুন নতুন তথ্য সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ যেখানে অনিশ্চয়তার গভীরে সেখানে এই মডেলের ভূমিকা অসাধারণ।

মডেল কথাটির অর্থ কি ?

কথাটি ল্যাটিন শব্দ Modus থেকে উদ্ভূত। মোডাস কথাটির অর্থ হল মাপা। তাই মডেল কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, কোনো বিষয়বস্তু বিশেষে তার মাপ নির্ণয় করা বলা চলতে পারে। কমপিউটার আর গাণিতিক মডেল আজকাল বিশ্বের সব জায়গাতেই, বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই ব্যবহার করা হচ্ছে। মডেলের যে সাফল্য, তা সম্পূর্ণ তথ্যের উপরে নির্ভর করে। নির্ভর করা যায় এমন তথ্য দরকার এবং অনেক তথ্য—তথ্য যদি কম থাকে, তাহলে সিদ্ধান্ত বা ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

কোনো কালবৈশাখীর কথা ধরা যাক। পূর্বাভাস নিয়ে এর মডেল তৈরি করা কিন্তু এক কথার ব্যাপার নয়। আবহাওয়া সম্পর্কিত চল আর প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে সমস্ত হিসেব-নিকেশ এতই জটিল আর ব্যাপক যে, কমপিউটার ব্যবহার না করলে কোনোরকম পূর্বাভাস দেওয়াই সম্ভব নয়। আবার কমপিউটার ঘেঁষা কোনো

গাণিতিক মডেল যথাযথ হতে হলে তথ্য সংগ্রহ ক'রে যেতে হবে—দু' একদিনের জন্যে নয়, দীর্ঘকাল ধরে, বিভিন্ন চলও নির্দিষ্ট করা দরকার, তথ্যভিত্তিক ভাবে চলগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কি, সেটাও জানতে হবে বিস্তারিত ভাবে।

গণিতের দিক দিয়ে আবহমণ্ডলের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে কমপিউটারের সাহায্যে দেখা গেছে যে, আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা দ্বিগুণ হলে আমাদের পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ২ ডিগরি থেকে ৫ ডিগরি সেলসিয়াসের মত বেড়ে যাবে।

নিউ ইয়র্কে Goddard Institute for Space Studies সংস্থা সংক্ষেপে GISS একটি আবহ-মডেল তৈরি করে। মডেলটি যাঁরা তৈরি করেন, তাঁদের মধ্যে জেম্‌স ই হ্যানসেন একজন। ইনিও মডেলটি থেকে এই উত্তাপ বৃদ্ধির কথা সমর্থন করেন।

তবুও অনিশ্চয়তা রয়ে যায়। সাগর-মহাসাগর তো মায়ের মত। অনেক উত্তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতটা তা কে বলবে? তারপর আছে মেঘ—মেঘ একটা চল, কিন্তু এর সম্পর্কেও নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মেঘের সংখ্যা আর আগের মত থাকবে না, তার ধরনও বদলে যাবে, সেই সঙ্গে অবস্থানেরও হেরফের ঘটবে। কিন্তু ঠিক কি ভাবে তা আমাদের আবহাওয়ার উপরে প্রভাব ফেলবে তা জানা যায়নি। তা ছাড়া আমাদের নিজেদের কথাও তো আছে। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, জ্বালানির খরচও বেঁধে রাখা যায়নি, বন কাটছি, কতটা তা সংরক্ষণ করবো, কে বলবে? এ সবই তো আমাদের উপরেই নির্ভর করে। আর কার্বন ডাই-অক্সাইডকে কমিয়ে আনার জন্যে প্রযুক্তি-জ্ঞানকেও নিশ্চয়ই কাজে লাগানো হবে। কিন্তু তাই বা কতটা কার্যকর হবে?

তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি তিন ডিগরি সেলসিয়াসের মত বেড়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর জলবায়ুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তো ঘটবেই, তা ছাড়া ওই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্যে মেরু প্রদেশে

জমে থাকা চিরতুষার অঞ্চলের হিমশৈল কিছু কিছু গলে যাবে নিশ্চয়ই। ফলে সাগর-মহাসাগরের জলের পরিমাণ আর আগের মত থাকবে না। দেখা যাবে, গলে যাওয়া হিমশৈল জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে। তাহলে সমুদ্রের পাশের নিচু এলাকাগুলি চলে যাবে জলের তলায়। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে কত অসংখ্য ছোট দ্বীপ আর দ্বীপপুঞ্জ, সমুদ্র-তল থেকে যারা মাত্র কয়েক মিটার মাথা তুলে রয়েছে, সমুদ্র-তল উঠে এলে সেগুলিও আর ভেসে থাকবে না।

আমাদের নিজেদের কি হবে, এই পশ্চিমবাংলার? দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, কলকাতা ও মেদিনীপুর জেলার সব নিচু অংশের চিরকালের মত সমুদ্রের তলায় চলে যাওয়া বিচিত্র নয়। তা ছাড়া উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তো আছেই।

বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন, ১·৫ ডিগরি থেকে ৪·৫ ডিগরি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ভূ-গোলকে সমুদ্রতল ৪০ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার উঠে আসতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

তবে এত বড় পৃথিবীতে সব জায়গায় যে তাপমাত্রা একই ভাবে বেড়ে যাবে, তা নয়। নানা রকম চিত্র দেখা যাবে আমাদের এই বিশ্ব জুড়ে, মেরু প্রদেশে এক রকম, নিরক্ষ অঞ্চলে আর এক রকম। শেষ পর্যন্ত গড় নিলে দেখা যাবে, মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা হবে গড় তাপমাত্রার দু' তিনগুণ, কিন্তু নিরক্ষ অঞ্চলে গড়ের ৫০ থেকে ১০০ ভাগ।

ফলে আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসবে, বায়ুপ্রবাহের ধাঁচ বদলে যাবে, সমুদ্র-স্রোতেরও পরিবর্তন ঘটবে। এক একটা পরিবর্তনের ফল এসে পড়বে তাপমাত্রার উপরে। ব্রিটেন এবং আইসল্যাণ্ড আরও শীতল হবে, কিন্তু বিশ্বের বাকি অঞ্চলের উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে। তাপমাত্রা বদলালে বৃষ্টিপাতের উপরেও তার প্রভাব এসে পড়বে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক থাকবে না। কোনো অঞ্চল হবে বেশি আর্দ্র, কোনো অঞ্চলে শুষ্কতা বাড়বে।

তা ছাড়া পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার জন্যে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উত্তাপও বেড়ে যাবে। ফলে সাইক্লোন এবং অন্যান্য ঝড়ের সংখ্যা-বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে। পরিণতিতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের জীবজন্তুর উপরে একটা চাপ এসে পড়া অসম্ভব নয়। মাছেদের অস্তিত্বও বিপন্ন।

কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিন্ত ভাবে কিছু বলা কঠিন। যে পরিবর্তন আসবে, তা যে কখন কি ঘটাবে, তা অনুমান করা সহজ নয়—কোথাও কোথাও অসম্ভব।

কিন্তু তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে কি? বিজ্ঞানীরা কি বলেন?

বিজ্ঞানীদের অভিমত, পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র-তল উঠে আসছে। শুনে মনে হতে পারে, এ কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীর মত। কিন্তু বাস্তবে এমনটাই ঘটছে এবং আগামী দিনগুলিতে এর হার আরও বাড়বে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আজ পর্যন্ত, যদি গত দেড়শো বছরের হিসেব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, আবহ-মণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বেড়ে যাবে। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক থাকলেও সে সম্পর্ক কোথায়?

কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারি গ্যাস। সেইজন্যে বাড়তি এই গ্যাস স্বভাবতই ভূ-স্তর সংলগ্ন অঞ্চলে এবং মহাসাগরের জলসীমার ঠিক উপরে জমা হতে থাকে। এই গ্যাসের একটা ধর্ম, এই গ্যাসের ভিতর দিয়ে আলোক-তরঙ্গ এবং সৌর তাপ সহজেই চলে আসে কিন্তু পৃথিবী যে তাপ বিকিরণ করছে, সে তাপ কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায় না। অর্থাৎ সূর্যালোকের কাছে এই গ্যাস স্বচ্ছ। ফলে সূর্যালোক এসে ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত ক'রে তোলে এবং ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে তাপরশ্মি বিকিরণ করে। এই তাপরশ্মি আসলে অবলোহিত রশ্মি। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সূর্যালোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বড়। সেই-জন্যে এ আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের প্রাচীর ভেদ ক'রে

মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতে পারে না। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে শুধু ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই প্রবেশের যোগ্যতা রাখে। ব্যাপারটা এ রকম যে, কোনো শীর্ণকায় লোক দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো স্বচ্ছন্দে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সেরে রীতিমতো স্থূল আকার ধারণ ক'রে বেরোনোর সময়ে দেখলো যে, যেখান দিয়ে সে ভিতরে এসেছে, বেরোনোর পক্ষে আগের সে পরিসর যথেষ্ট নয়। এইভাবে আটকে থাকা তাপরশ্মির প্রভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের স্তর ক্রমশ গরম হয়ে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বাস্তবিক পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে।

এই ঘটনাটিকে পরিভাষায় গ্রিন হাউস এফেক্ট বলা হয়ে থাকে। শীতের দেশে ক্যাকটাস বা অর্কিড জাতীয় গাছ খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়লে মরে যেতে পারে। এই সব গাছকে সজীব রাখার জন্যে সারি দেওয়া নিচু ঘর তৈরি ক'রে তার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। ঘরের ছাদগুলি ঢালু, শার্সি দিয়ে আঁটা। দিনের বেলায় এই ধরনের ঘরের ভিতরে কাচের শার্সি দিয়ে প্রচুর সূর্যালোক ঢোকে। ফলে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় আর অনুকূল পরিবেশে গাছগুলি বেড়ে ওঠে। আবার রাতে যখন ভূ-পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হয়ে তাপরশ্মি বিকিরণ করে, তখন এই সবুজ ঘেরা গ্রিন হাউসগুলির মধ্য থেকে বিকিরিত তাপরশ্মি কাচের শার্সি ভেদ ক'রে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। তখন বিকিরিত তাপরশ্মির কাছে কাচ অস্বচ্ছ। ফলে গ্রিন হাউসের মধ্যে তাপমাত্রার মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থাকে। সেইজন্য শেষ রাতে বা ভোরের দিকে চারপাশের তাপমাত্রা যখন অনেক নেমে আসে, তখন ভেতরের তাপমাত্রা তুলনায় বেশি থাকে। ফলে গাছগুলির কোনো ক্ষতি হয় না।

গ্রিন হাউসের মধ্যে তাপ যেমন আটকা পড়ে থাকে, তা যেমন বেরিয়ে যেতে পারে না, সেই রকম আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে তাপ বাধা পড়ে থাকে বলে, আবহমণ্ডলের এই ব্যাপারটাকেও গ্রিন হাউস এফেক্ট বলা হয়। শীতকালে একই
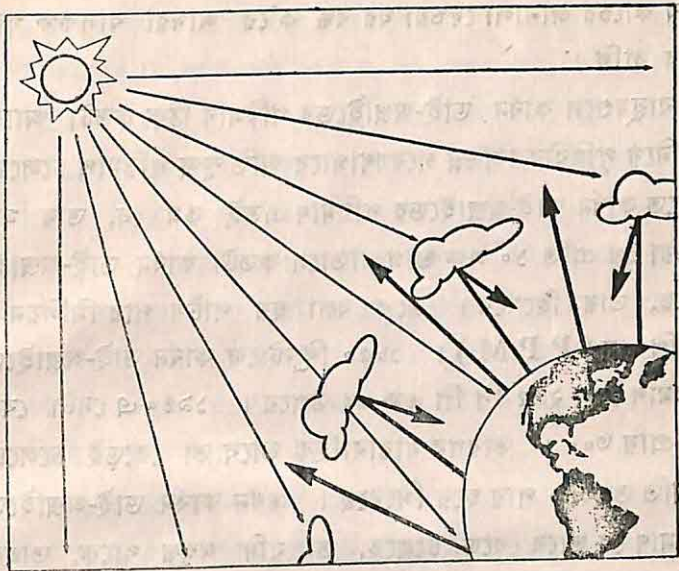
গ্রিন হাউস এফেক্ট
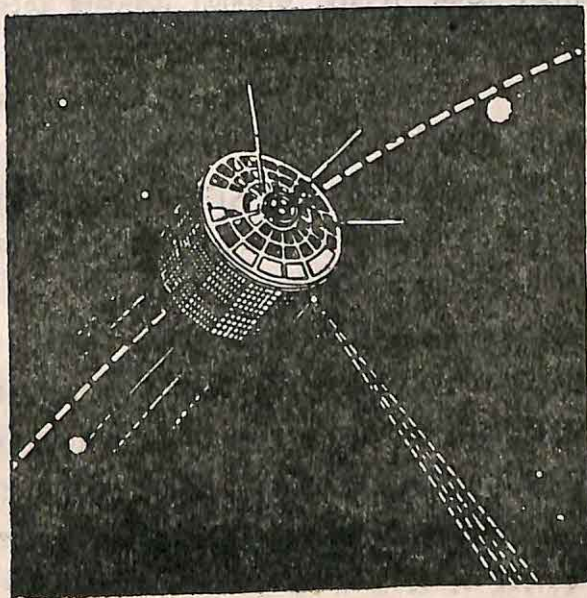
আধুনিক কালে ব্যবহৃত উপগ্রহ। আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভাবে কাচের জানালা দেওয়া ঘর বন্ধ ক'রে আমরা বাসকক্ষ গরম ক'রে রাখি।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ঠিক কতটা আছে, তা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ চলেছে। বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এতই কম যে, তার মাপ নেওয়া হয় প্রতি ১০ লক্ষ ভাগ বাতাসে কতটা কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে, তার হিসেবে। একে বলা হয় পার্টস পার মিলিয়ন বা পি পি এম (PPM)। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৮৫ পি পি এম-এর উপরে। ১৯৫০-এ সেটা বেড়ে হল প্রায় ৩০০। তারপর ধারাবাহিক ভাবে তা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি তা ৩৪০ পার হয়ে গিয়েছে। এখন কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহলে আগামী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ৫০০-এর কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারি। তখন পৃথিবীর তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে দেড় ডিগরি সেলসিয়াসের মত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

আবহমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড নেই, তার সঙ্গে আছে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লুরো-কার্বনও। এদেরও পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। তবে এই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর মিথেনের ভূমিকাটাই আসল।

পৃথিবীর তাপমাত্রা যেমন নির্ভর করে ভূ-স্তরে অনেকটা কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের উপরে, তেমনি আর একটি নিয়ামকের কথাও বলতে হয়। এটি হল অনেক উপরে ওজোন মণ্ডলে ওজোন স্তর। ভূ-পৃষ্ঠ ছাড়িয়ে যদি ক্রমশ উপরে উঠে যাওয়া যায়, তাহলে প্রথমে ট্রোপোস্ফিয়ার, তারপরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। প্রধানত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেই ওজোনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৫ থেকে ৫০ কিলোমিটারে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের অবস্থান। তবে ওজোনের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার উপরে।

এই স্তর মহাজাগতিক রশ্মি এবং অতি-বেগনী রশ্মি শোষণ করে এবং সূর্যকিরণের যে অংশ ক্ষতিকর নয়, শুধু সেইটুকুই এই স্তরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে। মহাজাগতিক আর অতি-বেগনী রশ্মি শুষে নেওয়ার ফলে এই স্তরের তাপমাত্রা অনেকখানি বেড়ে যায়। কিন্তু যে সব ক্ষতিকর রশ্মি ওজোন-স্তরে আটকে থাকছে, ভূ-পৃষ্ঠে কোনোক্রমে এসে পৌঁছোলে সেগুলিতে আমাদের শারীরিক ক্ষতি তো হতই, তা ছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াতেও এদের একটা ভূমিকা থাকতো। এখন কোনো কারণে যদি দেখা যায় যে, ওজোন-স্তরের ভর কমে যাচ্ছে, তাহলে তা কিন্তু সত্যিই চিন্তার কথা।

রেফ্রিজারেটারে ফ্রিয়ন গ্যাস ব্যবহার করা হয় আমরা জানি। এই ফ্রিয়ন গ্যাস এবং এরকম আরও কিছু কিছু গ্যাস আছে, যারা ওজোন-স্তরের সংস্পর্শে এসে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই ওজোন-স্তরকে দুর্বল ক'রে তুলবে। এবং বর্তমানে যন্ত্র-যুগে এরকম ব্যাপার সত্যিই ঘটে চলেছে।

ওজোন-স্তর আরও একভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান চালাতে হলে এমন অঞ্চল দিয়ে তা নিয়ে যেতে হবে, যেখানে আবহাওয়া অত্যন্ত হালকা অর্থাৎ বায়ুর প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম। এজন্য স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারই আদর্শ। ফলে নিস্তরঙ্গ জলে ইট ছুঁড়লে যেমন ঢেউ ওঠে এবং সেই ঢেউ যেমন চারপাশে ছড়িয়ে যায় তেমনি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সমার্থক ওজোন-স্তরও বিক্ষুব্ধ হয়। তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালে মহাকাশযানের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। হয় নিত্য-নতুন মহাকাশযান উৎক্ষেপিত হচ্ছে, নয় তো যেগুলি আগে উৎক্ষেপিত হয়েছিল, সেগুলি ক্রমশ নিচে নেমে এসে জ্বলে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর ফলেও ওজোন-স্তরে তোলপাড় চলেছে। আর সেইজন্যে ওজোন-গ্যাস ক্রমশ উপর-নিচে ছড়িয়ে গিয়ে ওজোন-স্তরের ঘনত্বকে কমিয়ে দিচ্ছে। সব দিক দিয়ে ওজোন-স্তরের ভিতর দিয়ে মহাজাগতিক এবং

তেজস্ক্রিয় রশ্মি ঢোকার পথে বাধা কমে আসছে। এভাবেও পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

এত সব হিসেব-নিকেশ সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ থেকে যায় অনিশ্চয়তার গভীরে।

আবহাওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা অতীতকে বলছেন ভবিষ্যতের পটভূমি। ফলে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অতীতের জলবায়ু জানার চেষ্টা ক'রে আসছেন বিজ্ঞানীরা কিছুকাল ধরে। পৃথিবীর অনেক জায়গায়, বিশেষ ক'রে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমদিকে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে, এক ধরনের পাইন গাছ আছে যার বয়স প্রায় ৯০০০ বছরের কাছাকাছি। যে-বছর বৃষ্টি বেশি পায়, এই ধরনের গাছ সেই বছর বেশি বাড়ে, আবার খরার বছরে এর বৃদ্ধি কম। যদি এই গাছ একটা কাটা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, গাছের গুঁড়ির কাছে অনেকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত রয়েছে। এই প্রতিটি বৃত্ত এক বছরে গাছ কতটা বেড়েছে, তার ইঙ্গিত। সুতরাং ওই পাইন গাছের গুঁড়ির ভিতর যে চক্র দেখা যায় তা থেকে একটা ধারণা পাওয়া যাবে যে, প্রতি বছর বৃষ্টিপাত কেমন হয়েছিল। ফলে ওই স্থানের জলবায়ুর একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। তবে এইজন্যে একটা গাছকে একেবারে কেটে ফেলার দরকার নেই। একটা যন্ত্র দিয়ে গাছ ফুটো ক'রে ওই ছিদ্রের ভিতর যতটা কাঠ ধরে ততটা খুবলে বের ক'রে আনা হয়। সেটাকে বিশ্লেষণ করলেই বিগত কয়েক হাজার বছরের জলবায়ুর খবর মেলে। এই যে বিজ্ঞান, এর নাম Dendro-climatology। আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। আর একটা উপায়েও বিগত যুগের জলবায়ুর অবস্থা নিরূপণ করা হয়। সেটা হল, মিশরের নীল নদের বন্যার হিসেব। প্রাচীন মিশরীয় পুঁথিপত্রে এই নীল নদের বন্যার প্রতি বছরের খবর মেলে। এগুলি বিশ্লেষণ ক'রেও চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর দেশে কি রকম বৃষ্টিপাত ঘটতো, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

বর্তমানে অতীতের আবহাওয়ার খবরের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের মূল সুরটি সম্পর্কে অনেকটাই জানা সম্ভব হয়েছে। মাত্র ১৫ হাজার বছর আগে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের উত্তরাংশের অনেকটাই বরফে ঢাকা ছিল। আবহমণ্ডলের বিভিন্ন পরিবর্তনই কি এজন্য দায়ী? সুস্পষ্টভাবে এর উত্তর দেওয়া কঠিন।

কিন্তু হিমশৈলের ভিতর থেকে আবদ্ধ থাকা বাতাসের যৎকিঞ্চিৎ নমুনার সাহায্যে অতীতের আবহমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। এ নিয়ে ফরাসি এবং সোভিয়েত উদ্যোগে দুই দেশের একটি যুগ্ম গবেষক দল কুমেরু অঞ্চলে একটি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এটি কুমেরু ভোস্টক স্টেশন নামে পরিচিত। বরফের ভিতর থেকে যে নমুনা নেওয়া হল, তা সংগ্রহ করা হল 'ড্রিল' ক'রে।

ভোস্টকের মূল অংশটি ২২০০ মিটার দীর্ঘ। এর ভিতর থেকে গত ১ লক্ষ ৬০ হাজার বছরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব। দেখা গেছে তাপমাত্রার হেরফের হয়েছে ১০ ডিগরির মত।

কিন্তু তাপমাত্রার এই পরিবর্তন জানা গেল কিভাবে? দুটি আইসোটোপের অনুপাতের পরিবর্তন থেকে এই পরিবর্তন যায় জানা, বিজ্ঞানীরা আজ এ রকম একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন।

আইসোটোপ কাকে বলে?

কোনো পদার্থের কেন্দ্রীণের চেহারাটা কল্পনা করা যাক। কেন্দ্রীণে প্রোটনের সংখ্যা নির্দিষ্ট কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আইসোটোপ পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনের কথা ধরা যাক। হাইড্রোজেনে থাকে একটা প্রোটন এবং একটা ইলেকট্রন। কিন্তু এর সঙ্গে একটা নিউট্রন যোগ হলে তা হয়ে যাচ্ছে ডয়েটেরিয়াম। আরও একটা আইসোটোপ আছে হাইড্রোজেনের। তাতে কেন্দ্রীণে থাকে দুটো অতিরিক্ত নিউট্রন। একে বলা হয় ট্রাইটিয়াম।

ভোস্টক পরিকল্পনায় অতীতের তাপমাত্রার হদিশের জন্যে সমুদ্র-গর্ভের পলিতে অক্সিজেনের দুটি পরিচিত আইসোটোপ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হন।

ভোস্টক পরিকল্পনায় সংগৃহীত তথ্য থেকে আরও একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল। ১ লক্ষ ৬০ হাজার বছর ধরে আবহমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের প্রাচুর্যের সঙ্গে কিভাবে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে তা লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অকসাইডের ঘনত্ব বেড়ে যায়, কমলে আবার কমে। তাপমাত্রা এবং কার্বন ডাই-অকসাইডের মধ্যে সম্পর্ক মিথেনের ক্ষেত্রেও রীতিমতো অনুসৃত হয়, দেখা যায়।

ভোস্টক পরিকল্পনায় ২২০০ মিটার দীর্ঘ যে কূপ খনন করা হল তাতে বিভিন্ন গভীরতায় আটকে থাকা বাতাসের বুদ্বুদে কার্বন ডাই-অকসাইড এবং মিথেন লক্ষ্য করা গেল। বিভিন্ন গভীরতা অর্থ সময়কাল এক নয়, নিঃসন্দেহে তা ভিন্ন।

প্রাচীনকালে তাপমাত্রা নির্ণয়ের আরও উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। বরফের মধ্যে ডয়েটেরিয়ামের ঘনত্ব অতীতের তাপমাত্রা নির্ণয়ের একটি উল্লেখ করার মত পদ্ধতি। আর কার্বন ডাই-অকসাইডকে তো এই বিশ্বজগতের থার্মোমিটার হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে।

অতীতের আবহাওয়ার হালচাল নিঃসন্দেহে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা পূর্বাভাস দেবে। তবে সে পূর্বাভাসে এখনও উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেইজন্য চূড়ান্ত ঔদাসীন্যে তাকে অবহেলা ক'রে চলবো, এমনও নয়। প্রকৃতি মাতৃসমা, তবু তাকে নিপীড়ন যত কম করা যায়, ততই তা আমাদের পক্ষে মঙ্গল।

আমাদের আবহাওয়া সংস্থা

আমাদের পরিবেশ আমাদের এই আবহমণ্ডল। এই যে আবহমণ্ডলে নানা ধরনের ঘটনার ঘনঘটা, যাকে আমরা আবহাওয়া বলে থাকি, আমাদের জীবনযাত্রার উপরে তার অসামান্য প্রভাব আছে। এ কথা না মেনে উপায় নেই। আর এই প্রভাব যে অকস্মাৎ হ্রাস পাবে, এমন হওয়ার সুযোগও কম। কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে আমাদের জল ছাড়া চলে না। সেই সঙ্গে মানুষের হাতে তৈরি এমন কটা উদ্যোগের কথাই বা চিন্তা করা যায়, যেখানে জলের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। জলযান, জলের আধারের সঙ্গে জলের সম্পর্ক। কিন্তু সরাসরি জলের উল্লেখ নেই, স্বাস্থ্য পরিকল্পনার মত এমন যদি কোনো পরিকল্পনার কথা উল্লেখও করা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে, তার সঙ্গে জলের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রকমের।

এই জলের কথা বলতে গেলে বর্ষণ আর আবহাওয়ায় কথা মনে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রাত্যহিক আবহাওয়ার সঙ্গে সকলেরই যোগাযোগ। কখনো সে যোগাযোগ সামান্য, কখনো তার ফলে জীবন আর ধনসম্পত্তি নিয়ে টানাটানি।

এ শুধু আজকের কথা নয়, সৃষ্টির আদিপর্বে মানবজীবন সৃষ্টির সময়কাল থেকে আবহাওয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা লক্ষ্য করার মত। কিন্তু হলে কি হবে, একেবারে আধুনিক কালে জানা যায় যে, কোনো আবহাওয়া প্রণালী স্থির নয়। তা চলমান, গতিশীল। সাইক্লোনের চোখ থেকে যখন কোনো সাইক্লোন ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে, তখন কোথায় যে দুর্যোগ ঘটবে, তার জন্যে জানা দরকার, কোন পথে সে এগোবে। আর দুর্যোগ কবে কোথায় ঘটবে বোঝার জন্যে তার ছুটে চলার গতিবেগ জানতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এ সব কারণে কোনো সাইক্লোনকে লক্ষ্য করতে হবে একেবারে তার অঙ্কুরোদ্গমের সময়কাল থেকে—বেশির

ভাগ সময়ে আমাদের দেশের সীমারেখা পার হয়ে বিদেশের আকাশে এবং পরিমণ্ডলে। সেইজন্যে কোনো দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্যে তার চারপাশের দীর্ঘ একটা অঞ্চল জুড়ে আবহাওয়ার সাম্প্রতিকতম সমস্ত রকম খবরাখবর সংগ্রহ করতে হয়। এই কারণেই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে আবহাওয়ার গবেষণা দরকার আর সেখানে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা না হলে চলে না।

এই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা (International Meteorological Organisation) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এটির নতুন নামকরণ হয় World Meteorological Organisation।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া সম্পর্কেও আমাদের ধারণা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাপমাত্রা, বাতাস, বায়ুর চাপ, মেঘ-বৃষ্টি—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ আবহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এ একদিনে সিদ্ধিলাভ নয়, ধীরে ধীরে মানুষ সমস্ত বিষয়টিকে অধিগত করার চেষ্টা করেছে। বর্তমানে মানুষ আবহমণ্ডলের হালচাল সম্পর্কে অনেক কথাই জেনেছে এবং তার লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই আবহ-বিজ্ঞান আজ একটা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

পৃথিবীতে আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের যে বিস্তার ঘটে, তার মূলে ছিলেন বিভিন্ন দেশের নাবিকেরা। ভাল নাবিকের ভাল আবহবিদ্ না হয়ে উপায় ছিল না। অথচ সময়মতো খবর পেলে কত জাহাজ-ডুবি বাঁচানো সম্ভব হয়, কত বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, শেষ পর্যন্ত নাবিকদের উদ্যোগেই ব্রুসেলসে আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদ প্রেরণ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। এটিই

সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা এবং বলা চলে আন্তর্জাতিক আবহবিদ্যার এই সূত্রপাত।

বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ পাওয়া যাবে না, যেখানে জাতীয় স্তরে আবহাওয়ার কোনো ভূমিকা নেই। নিজ নিজ দেশের আবহাওয়া নিয়ে তো কাজ চলেইছে, সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভিন্ন দেশ নিজ ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

যদি পুরো ২৪ ঘণ্টার হিসেব নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রায় ১ লক্ষ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওই সময়ে ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে লিপিবদ্ধ করা পর্যবেক্ষণের সংখ্যা প্রায় ১১০০০। ওই পর্যবেক্ষণ সংগ্রহের জন্যে কাজ করছে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জুড়ে ছড়ানো ৮০০০ আবহ-কেন্দ্র, ৩০০০ পরিবহণ এবং পর্যবেক্ষণ বিমান, তা ছাড়া আরও প্রায় ৪০০০ বাণিজ্য-জাহাজ। সবাই পর্যবেক্ষণ নিচ্ছে একই সময়ে। তাহলে এভাবে সংগৃহীত তথ্য কম নয়। তা ছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন আবহাওয়া-উপগ্রহ এবং রকেট থেকে পাঠানো সংবাদ। সব মিলে এক দক্ষ-যজ্ঞ ব্যাপার।

আমাদের দেশের দিকে তাকানো যাক। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগে এ দেশে ঝড়-ঝঞ্ঝা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু তখন আবহবিদ্যায় আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকার জন্যে আবহ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগকে আমাদের বিধাতার অভিশাপ হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরে কলকাতা যখন এ দেশের রাজধানী হল, তখন হুগলি নদী ও বঙ্গোপাসাগরে জাহাজ চলাচল বহুলাংশে বেড়ে যায়।

ইংরাজ নাবিক জাতি। তখনকার ইংরাজ সরকার একথা যথাযথ অনুধাবন করলো যে, নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্যে ইংল্যাণ্ডের মত এ দেশেও একটা আবহাওয়া-বিভাগ খোলা

দরকার। সুতরাং প্রয়োজন থেকেই আবহাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি।

আঞ্চলিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল। এটি খুব বেশিদিন আগের কথা না হলেও, কলকাতায় আবহ পর্যবেক্ষণের সূচনা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। তখন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল পার্ক স্ট্রিটে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অফিসে। অবশ্য ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ কাজ করেন। ১৮০৫ থেকে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেম্‌স কিড খিদিরপুরে হুগলি নদীতে দিবারাত্র জোয়ার-ভাটার খবর রাখতেন। ১৮১৬ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত হার্ডউইক দমদমে বৃষ্টিপাত এবং বায়ুর চাপের হিসেব রাখেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত আর এভারেস্ট আবহাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের খবরাখবর রাখতে শুরু করেন। কিন্তু আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন পিডিংটন। ১৮৫৬-এ পিডিংটন প্রথম সার্ভে অব ইণ্ডিয়া থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করেন। সামুদ্রিক ঝড় বোঝাতে গ্রিক শব্দ 'সাইক্লোন' ইনিই প্রথম প্রয়োগ করেন। সাইক্লোন অর্থ সাপের কুণ্ডলী। নিজের চেষ্টায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের নানা ব্যবস্থা করা ছাড়াও ১৮৩৯ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও সামুদ্রিক ঝড়ের বিস্তারিত তথ্য নাবিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে পিডিংটন নথীভুক্ত করেন।

১৮৫৭-এর আগে এ অঞ্চলে একটা সাইক্লোন ঝড় হয়। তখন কলকাতায় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান বলতে ছিল জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। এর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর একটা আবহ-সংক্রান্ত কমিটি ছিল। এই কমিটি 'অপারেশনাল' ছিল না। ওই সাইক্লোন ঝড়ের পরে এই আবহ-সংক্রান্ত কমিটি হেনরি এফ ব্লানফোর্ডকে 'Meteorological Reporter to the Government of Bengal' হিসেবে মনোনীত করে। ব্লানফোর্ড তখন ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে। ব্লানফোর্ড কলকাতা বন্দরের জন্যে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ আরম্ভ করেন।

পরবর্তিকালে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতার বুকের উপরে দিয়ে একটা মারাত্মক সাইক্লোন ঝড় বয়ে যায়। এ রকম সাইক্লোন ঝড় যদি বারংবার আসতে থাকে, তাহলে সমুদ্রের বুকে ভাসমান জাহাজগুলির গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সেইজন্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত একটা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে জাহাজ কোম্পানিগুলি দাবী জানাতে থাকে।

আবহাওয়া সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার জন্যে ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৪ পর্যন্ত পরবর্তী ১০ বছরে দেশে পাঁচটি প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বাংলার কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এর প্রথম রিপোর্টার ছিলেন ব্লানফোর্ড। রিপোর্টারের কাজ সরকারের কাছে আবহ-সংবাদ সরবরাহ করা এবং তদনুসারে পরামর্শ দেওয়া। ব্লানফোর্ড তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের একজন অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

ভারতীয় আবহ-সংস্থা (India Meteorological Department) গঠিত হয় ১৮৭৫-এ। কলকাতাতেই এর কর্মকেন্দ্র। ব্লানফোর্ড ছিলেন এর ইম্পিরিয়াল রিপোর্টার। ব্লানফোর্ড প্রথমে সারা দেশে পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র (Surface observatory) স্থাপন করতে আরম্ভ করলেন।

কলকাতার আলিপুরে একটি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৮৭৭-এর পয়লা এপ্রিল। ক্রমে এই সংস্থা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজকর্ম শুরু হয়। ডাক-মারফত আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা আরম্ভ হল ওই বছর থেকে। তার বা টেলিগ্রাফ মারফত পরের বছর। ঝড়ের সংকেত দেওয়ার কাজের সূচনা ১৮৮১-তে। দৈনিক মুদ্রিত আবহাওয়ার খবর প্রচার আরম্ভ করা হয় ১৮৮৩ থেকে। ভূ-কম্পন যন্ত্র প্রথম বসে ১৯১৫-তে।

নিখুঁত সময় নির্ণয় এবং প্রচার শুরু হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। পরে ১৯৪৩-এর মার্চে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসেবে তা অল্প কিছুদিন পুনেতে স্থানান্তরিত করা হয়।

যাই হোক, ব্লানফোর্ড ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে ছিলেন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্যার জন ইলিয়ট। ১৮৮৯-এ ইলিয়ট ডিরেক্টর-জেনারেলের পদ গ্রহণ ক'রে ওই বছরই ভারতীয় আবহ-সংস্থার কলকাতা শাখা এবং বাংলার আঞ্চলিক কেন্দ্র দুটিকে একত্রে নিয়ে আসেন। কলকাতায় এই দুটি মিলিত ভাবে ছিল ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের মুখ্যালয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সিমলা অফিসই মুখ্যালয় হয়ে ওঠে। ভারতীয় আবহ-সংস্থার তৃতীয় ডিরেক্টর-জেনারেল স্যার গিলবার্ট ওয়াকার কলকাতা অফিসের দায়িত্ব দেওয়ার জন্যে একটি নতুন পদের সৃষ্টি করেন—'Meteorologist, Calcutta' অর্থাৎ আবহবিদ্, কলকাতা নামে আংশিক সময়ের পদ।

এই পদে প্রথম নিযুক্ত হন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পিক। অধ্যাপক পিকের নিয়োগের সময় থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকরাই আবহবিদ্ হিসেবে নিযুক্ত হতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পদাধিকার বলে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ আবহবিদ্ পদে সর্বশেষ মনোনীত হন। তিনি আলিপুর আবহাওয়া আফিসে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এ কিছুদিন আবহাওয়া আফিসে কাটান। অফিস-চত্বরে বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের তলায় বসে ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেন—এই তথ্য বটবৃক্ষের তলদেশে এক ফলকে প্রোথিত আছে। কলিকাতা আবহাওয়া কেন্দ্র বর্তমানে হাওয়া আফিস নামে পরিচিত। শোনা যায়, এই নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবহাওয়া আফিস নতুন ঢংয়ে সাজানো হয়। টেকনিক্যাল মূল কেন্দ্র সিমলা থেকে গেল পুনেতে, দিল্লি

আফিস অনেক বড় করা হল এবং সমগ্র দেশ বিভক্ত হল ছ'ভাগে—করাচি, দিল্লি, কলকাতা, নাগপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ। দেশ বিভাগের পরে পাঞ্জাবের কিছু অংশের সঙ্গে করাচি চলে গেল পাকিস্তানে। এ দেশে আঞ্চলিক আফিস রইল পাঁচটি। পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশও ভারতীয় আবহ-বিভাগ থেকে পৃথক হল।

কলকাতা আঞ্চলিক আবহ-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় আজ থেকে প্রায় ৪৭ বছর আগে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল। এর দায়িত্ব শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, উড়িষ্যা, সেই সঙ্গে আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড সিকিমের মত সন্নিহিত রাজ্যসমূহ পর্যন্ত কলকাতা কেন্দ্রের দায়িত্ব বিস্তৃত। তা ছাড়া আছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। পরিমাণের দিক থেকে এর বিস্তৃতি সাড়ে ৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি।

আবহ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে সমগ্র বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া এবং সতর্কীকরণের মত গুরু দায়িত্ব কলকাতা কেন্দ্রের উপরে ছিল। এখন পূর্ব তটরেখার পূর্বাভাসের মূল দায়িত্ব কলকাতার, কিন্তু সতর্ক করার দায়িত্ব বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের উপরে দেওয়া হয়েছে।

———

আবহাওয়ার পূর্বাভাস…

'আবহাওয়া'—কথাটার সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও এর পূর্বাভাস দানের বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। একসময় আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে কেন্দ্র করে অনেক হাসি ঠাট্টা হতো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পূর্বাভাস দান অনেক প্রত্যয়সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। কেমন ক'রে দেওয়া হয় পূর্বাভাস—হাওয়া আফিসের সেই বিরাট কর্মকাণ্ডের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই বইতে। এই প্রসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আবহাওয়ার অতীত ও ভবিষ্যত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানের ইতিহাস।

লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য বিজ্ঞানে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। বিজ্ঞানের বহু বিষয়কে সহজ সরল বাংলা ভাষায় উপস্থাপনাই তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। বর্তমান গ্রন্থটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

মূল্য : ২০ টাকা

বেস্টবুক্‌স্

১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

ISBN : 81-85252-48-3